জানুয়ারী-জুন 2000

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ | প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা | দাম সাড়ে সাত টাকা

বেড়ে ওঠে শিশুরা

পরমাণুবিদ্যুৎ কেন্দ্র বিতর্ক

পরিবেশ আইন কানুন

বস্তুবাদ ও সমসাময়িক আত্মিকতা

একটি অপরূপ কথা

■■□□

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও সমসাময়িক আত্মিকতা

রজার এস গটলিয়েব

[রজার এস. গটলিয়েবের (Roger S. Gotlieb) রচনা 'মার্কসবাদ ও আত্মিকতা'র (Marxism and Spirituality) অনুবাদের চতুর্থ ও শেষ কিস্তি (Historical Materialism and Contemporary Spirituality) উপস্থিত করা হল। বি ও বি র গত তিন সংখ্যায় পর পর প্রকাশিত অনুবাদের শিনোনামা ছিল যথাক্রমে : আমূল পরিবর্তনকামী রাজনীতি ও অহং, কষ্ট ক্রোধ ও আমূল পরিবর্তনকামী রাজনীতি *এবং* অহং-এর সীমাবদ্ধতা, মার্কসবাদ ও প্রকৃতি। *চার কিস্তিতে প্রকাশিত গোটা রচনাটাই তার রচিত* মার্কসবাদ 1844-1990. উদ্ভব, বিশ্বাসঘাতকতা, পুনর্জন্ম *(Marxism 1844-1990. Origin, Betrayal, Rebirth) বইটির শেষ অধ্যায়। লেখক পরিচিতিও রচনা সংক্রান্ত অন্য তথ্যের জন্য আগের কিস্তিগুলি দ্রষ্টব্য।]*

ঐতিহাসিক বিকাশ কি করে আরও ভাল ভাবে দুনিয়ার ভবিষ্যৎ ছবিকে বাস্তব করে তুলবে, তারই এক তত্ত্বের ওপর মার্কস তাঁর রচিত ভবিষ্যৎ ছবিকে দাঁড় করিয়েছিলেন। আত্মিক সচেতনতাকে আমূল পরিবর্ত্তনকামী রাজনীতির অঙ্গীভূত করে নেবার প্রয়োজন আছে বলে যে দাবী আমি করেছি, ঐতিহাসিক বস্তুবাদী নীতি সে পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া উচিৎ। আমি এখন এমন কয়েকটি সমসাময়িক সামাজিক ঝোঁকের উল্লেখ করবো, যা থেকে বোঝা যাবে যে জীবনের এক সজীব ও গুরুত্বময় আত্মিকরূপের সম্ভাবনাটা স্রেফ এক মনগড়া কল্পনাবিলাস মাত্র নয় :

প্রথমতঃ এই বিশ্বাসে এখন এক সর্বব্যাপী ভাঙন ধরেছে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্তহীন বিকাশ আরও সুখী ও ন্যায়পরায়ণ এক দুনিয়ার সৃষ্টি করবে। কিছুদিন হ'ল, প্রযুক্তি, পেশাদারীত্ব এবং পুরুষ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রণের উজ্জ্বল ভাবমূর্ত্তিতে এক ধরণের কলঙ্ক ধরেছে। আমাদের বর্ত্তমান শতকে আমলাতন্ত্র পরিণত হয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার (Genocide) এক হাতিয়ারে। আধুনিক প্রযুক্তির ফসল নানা জটিল কলকব্জাওয়ালা ভোগ্যপণ্যের মালিক যে জনসাধারণ, তারা মাদকাসক্তি ও এলোপাথাড়ি হিংসার অভিঘাতে যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে উজ্জ্বল বৈজ্ঞানিকেরা অস্ত্র উদ্ভাবনে নিবেদিত এবং আমাদের গোটা সভ্যতাই প্রকৃতির পক্ষে বিষের মতন। 'বৈজ্ঞানিক' অভিহিত ওষুধ, মনস্তত্ব, সামাজিক পরিকল্পনা এবং রাজনীতির সমস্ত স্ব-ঘোষিত বিশেষজ্ঞরা সবাই এইসব ব্যাধির সমাধান করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

কাজেই বহু মানুষই এমন ধরণের জ্ঞানের—বিশেষতঃ আত্মজ্ঞানের—খোঁজ করছেন, যাকে কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সূত্রবদ্ধ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে সাহায্য পাবার জন্য তাঁরা শরীর, মন, প্রকৃতি ও গোটা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে পরম্পরাগত, বা নতুন করে গড়ে তোলা নানা পরিপ্রেক্ষিতকে ব্যবহার করছেন। এইসব পরিপ্রেক্ষিতের মুখ প্রায়শঃ আত্মিক দিকেই ঘোরান থাকে এবং অহং-এর যে মূল কাঠামো, তাকেই এরা চ্যালেঞ্জ করে।

দ্বিতীয়তঃ 60-এর দশকের সামাজিক আলোড়ন বা অভ্যুত্থানগুলি, নানা ভাবেই আত্মিকতার ব্যাপারে গভীর উৎসাহের স্ফুলিঙ্গ তৈরী করেছিল। অভিনব মানসিক অভিজ্ঞতা সঞ্চারকারী নানা রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার থেকে এমন সব অভিজ্ঞতা পাওয়া যাচ্ছিল, যা সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা-র বাইরের এক চেতনার নানারূপের ইঙ্গিত দেয়। এরা এমনসব রূপ, বহু পরম্পরাতে বহু হাজার বছর ধরে যার চর্চা চলেছে ও যাকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তুরীয় অবস্থা কেটে গেলে রাসায়নিক দ্রব্য থেকে পাওয়া অপার্থিব অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ হয়ে পড়তো। তখন এরকম শিক্ষক খোঁজার চেষ্টা করাটা স্বাভাবিক, যাঁরা বাস্তবের চেনা সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া নতুন এক বাস্তবতার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালাতে সাহায্য করবেন। নানা ধরণের ধ্যান পদ্ধতি, যোগ, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যের সাহায্যে বা নির্দেশে মানসিক স্তরে নানা প্রত্যক্ষ অনুভূতি (visualization) (এ ধরণের মোটে কয়েকটি উদাহরণই দেওয়া হ'ল) থেকে এই প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছিল

যে ওষুধে আচ্ছন্ন অবস্থায় যে ধরণের বাধাবন্ধহীন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি (insight) লাভ করা যায়, সেগুলিকে আরও স্বাস্থ্যকর উপায়ে এবং শেষ বিচারে আরও ফলপ্রসূভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ করে নেওয়া সম্ভব।

পরিবেশগত যে চেতনা 60-এর দশকে প্রথম মুকুলিত হয়, তার সাথে আত্মিকতার এক মেল বন্ধন ঘটে। প্রযুক্তিগত স্তরে যে ধরেই নেওয়া হয় যে পৃথিবী হ'ল একটা "জিনিষ" (thing) মাত্র যার অন্তর্নিহিত কোন মূল্য নেই, মানুষ তাকেই প্রশ্ন করতে শুরু করে। আত্মিক পরিবেশবাদীরা (spiritual ecologists) এ কথাও ভাবতে শুরু করেন যে পরিবেশ বাঁচানোটা শুধু মানুষকে বাঁচানোর জন্যই নয়, নিজগুণেই পরিবেশ-এর যে মূল্য রয়েছে, তারই স্বার্থে এটা দরকার। এরই পাশাপাশি উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল উইক্কা (Wicca) বা "ডাইনীতন্ত্র"-এর শিক্ষা বা আমেরিকার আদি অধিবাসীদের পরম্পরাগত শিক্ষাতেও। এইসব পরম্পরা মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক শুধু প্রকৃতিকে ব্যবহার করার দিক থেকে দেখে না। দেখে, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক পবিত্র দেওয়া নেওয়া হিসেবে।

তৃতীয়তঃ অপরিমেয় বিত্ত ও অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ-কারী আমাদের সমাজকে, দুঃশ্চিন্তা, বিষাদ ও মাদকাসক্তি তাড়া করে বেড়াচ্ছে। এর জবাবে মনস্তত্ত্ব ও মনোচিকিৎসা ব্যাপকভাবে মানুষের উৎসাহ জাগিয়েছে। তথাপি মানবিকতাবাদীদের "ব্যক্তিগত বিকাশ" (personal growth)-এর আদল যদিও ধরা-বাঁধা সামাজিক ভূমিকার অনড় ছাঁচ-কে ভেঙে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে, তবুও সেটা প্রায়ই অহং-এর ব্যক্তিতান্ত্রিকতাকে অপরিবর্ত্তিতই রেখে দেয়। আবেগের স্তরের দুঃখ ও বেদনাকে আত্মিক দিক থেকে যেভাবে দেখা হয়, তাতে সামাজিক অহং (social ego) থেকেই যাবে সেরকম ধরে নেওয়া হয়না, যেমন ধরে নেওয়া হয় ধর্ম-বিযুক্ত মনস্তত্ত্বে (secular psychology)। আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে অহং-এর যে নিষ্ফলা প্রচেষ্টা, তার আওতার বাইরে চলে যাবার জন্য অনেকেই আসক্তি সম্পর্কে বৌদ্ধ সমালোচনা, মনকে স্থির করার জন্য যোগ শিক্ষা, সুফীবাদের রূপক কাহিনীগুলিতে লুকিয়ে থাকা নানা প্রাজ্ঞ উক্তি এসবের দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন।

চতুর্থতঃ আমাদের সমাজে ভোগবাদ ও পেশাগত সাফল্যের উপর যে এত বেশী জোর দেওয়া হয়, তা নিয়ে এক সর্বব্যাপী অসন্তোষ রয়েছে। আমাদের এতসব 'জিনিষ' রয়েছে তবু আমরা এত দুর্দশায় রয়েছি। যা আছে তাকে শান্তচিত্তে উপভোগ করা ও তার কদর করার বদলে আমরা কেবলই আরও আরও চাওয়ার উদগ্র আকাংখার শক্ত মুঠির কবলে পড়ে আছি, যে আকাংখা নতুন নতুন জিনিষ অর্জন করার মধ্য দিয়ে একমাত্র সাময়িক ভাবেই তৃপ্ত হতে পারে। ক্রীসমাসের সময় ভোগের যে উন্মত্ততা চলে, তার পরিসমাপ্তি ঘটে এক শূণ্যতাবোধে যার রেশ আর কাটতে চায়না। **যত চেষ্টাই করা যাক না কেন, পেশাদারী সাফল্য ও বিত্তের চিন্তায় আচ্ছন্ন মন কিছুতেই সন্তুষ্টি লাভ করে না।** এই দুর্দশাবোধ আত্মিক পরিপ্রেক্ষিতের দিকে আমাদের নিয়ে যায়। আত্মিক পরিপ্রেক্ষিত একথা অস্বীকার করে যে ঐহিক সম্পদ ও সামাজিক সাফল্য আমাদের সুখী করতে পারে বা আজকের ব্যর্থতার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিত মানবিক চরিতার্থতার অন্য আর-এক রূপকে তুলে ধরে।

পঞ্চমতঃ রাজনৈতিক আমূল পরিবর্ত্তনকামীরা ক্রমশঃ আরও বেশী সংখ্যায় তাদের সামাজিক মূল্যবোধ বজায় রেখেই এই সত্য দেখতে পাচ্ছে যে আত্মিক দিক থেকে অজ্ঞ রাজনৈতিক আন্দোলন বৃহত্তর সমাজের আধিপত্য ও আক্রমণেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে। তারা দেখেছে বাম শিবিরে কি অসংখ্য গোষ্ঠীভাগাভাগি হয়েছে। আমিই ঠিক—এই ভঙ্গীর কি বিপুল প্রাধান্য। কি পরিমাণে নিজেদের ক্রোধ, নিজেদেরই প্রশ্রয়ে পুষ্ট হয়েছে। তারা শিখেছে ক্ষমতার শিখরে বসা নানা গোষ্ঠী ও তাদের শিকারদের মধ্যে সংঘর্ষের পাশাপাশি সহবস্থান করে হৃদয় ও আত্মার সমাজজোড়া অসুস্থতা। **হিংসা, লোভ ও হতাশা কণ্টকিত সংস্কৃতির প্রয়োজন এমন এক বিপ্লবী রাজনীতির, যা সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের সাথে আত্মিক জীবনধারার শান্তি ও ভালবাসাকে মিলিয়ে নেবে। সামাজিক কাঠামোর বিশ্লেষণের সাথে মেলাবে নিজেকে জানার আত্মিক সন্ধান।**

আমূল পরিবর্ত্তনকামীদের এক প্রজন্ম যত তাদের মধ্য-বয়সের দিকে এগোচ্ছে, তত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান, বা কঠিন সব অভিজ্ঞতার অনেকগুলিরই মোকাবিলায় শুধু সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত নিতান্তই অপ্রতুল। যে সব বেদনা অবিচার জনিত নয়, বা যে সব প্রক্রিয়ার জন্য নিয়ন্ত্রণ নয়, দরকার নিরীক্ষণ করতে পারা বা গ্রহণ করতে পারা সেসব ক্ষেত্রে, যে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের অক্ষমতা খুবই প্রকট। জন্ম, শিশুদের বড়ো হয়ে ওঠা, মৃত্যু, নিজেদের মরণশীলতার

... এর পর 31 পৃষ্ঠায় দেখুন

বেড়ে ওঠে শিশুরা

ওমপ্রকাশ চক্রবর্তী

গাছপালা-ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে ছোটছোট ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে স্কুলে যাচ্ছে, এমন একটি ছবি ভাবতেই বেশ ভাল লাগে। সিকিমের জঙ্গলে-ভরা নির্জন পাহাড়ী পরিবেশে দেখা এরকম একটা ছবি মনে লেগে আছে। ছয়সাত বছরের কচিকাঁচাদের দল। ছেলেদের জামার বোতাম ছেঁড়া। মেয়েদেরও জামার পিঠের দিকে বোতাম নেই বললেই চলে। কারুরই পায়ে জুতো নেই। প্লাস্টিকের থলেতে বইপত্র প্রভৃতি। স্কুলে যাওয়ার পথে সাময়িক ছেদ টেনে মনের সুখে খেলছে। উঁচু ঢিপির উপর চড়ে লাফ দিচ্ছে, ফল কুড়িয়ে ঝোলায় ভরছে। গাছের ছালের ফেঁসোর সাহায্যে বড় বড় বটের মত পাতা মাথায় বাঁধছে—বোধহয় মুকুট করছে। ওদের কেউ রাজা, কেউ সেনাপতি; লাঠির ঠোকাঠুকিতে তলোয়ার যুদ্ধ হচ্ছে! রাজ্যপাট দখলের লড়াই! ছোটদের লেখাপড়া শেখানোর আয়োজনে খেলাধূলার অফুরন্ত সমাবেশ খুব দরকারী। মনে হয়, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আজকের শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর ক্ষেত্রে মোটেই গুরুত্ব পাচ্ছে না। একদিনের প্রত্যক্ষ করা একটা ঘটনার উল্লেখ এ প্রসংঙ্গে না করে পারলাম না।

দক্ষিণ কলকাতায় অফিস থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে সরকারী আবাসনে থাকি। বিকেলে ছুটির পর ফিরছি। আবাসন কমপ্লেক্সে ঢুকতেই ছোটদের হৈ চৈ'র আওয়াজ ভেসে এল। ভীষণ মাতোয়ারা ওরা খেলার আনন্দে। করিডর দিয়ে হেঁটে লিফ্‌টের দিকে এগুতেই চোখে পড়ল থামের আড়ালে মৈনাক লুকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই ইসারায় কি যেন বলল। যেন 'ওদের বলো না আমি এখানে লুকিয়ে' গোছের ইংগিত ! আর একটু এগুতেই চোখে পড়ল মৈনাকের মা অর্থাৎ মিতালী বৌদি চুপ করে দাঁড়িয়ে। ততক্ষণে বোধহয় অন্যকেউ 'চোর' হয়ে গেছে। নিশ্চিন্তে মৈনাক তার থামের আড়ালের লুকনোর জায়গা থেকে বেরিয়েছে রিল্যাক্সড্ মুডে। অমনি মিতালী বৌদি খপ্ করে তার হাত চেপে ধরলেন। টেনে নিয়ে তাকে লিফ্‌টে পুরে দিলেন। মৈনাক 'আর একটু খেলি না মা' জাতীয় কিছু বলছিল। কিন্তু মিতালী বৌদির হম্বিতম্বিতে তা চাপা পড়ে গেল। আমিও এই লিফ্‌টে। বোধহয় আমাকে দেখেই অনেকটা জবাবদিহি করার ঢঙে বললেন, 'কি করব বলুন, এ্যাত্তো হোম্‌টাস্ক! তার ওপর সামনেই পরীক্ষা। সব মিলিয়ে ভীষণ পড়ার চাপ। বিকেল বিকেল না বসলে সব ম্যানেজ্ করা যায়?" মৈনাককে তো দেখি। সকাল সাতটা না বাজতেই রেডি হয়ে বাবার সাথে কমপ্লেক্সের গেটে গিয়ে দাঁড়ায়। সাথে সাথে স্কুলের বাস চলে আসে। ফিরতে ফিরতে নিশ্চয় দুপুর গড়িয়ে যায়। তারপর খেয়েদেয়ে বিশ্রামের পর নিশ্চয় মিতালী বৌদির কোন স্পেশাল দাওয়াই থাকে 'ভীষণ পড়ার চাপ' সামলানোর। বিকেলের লোক দেখানো একচিলতে খেলা! তাও মিতালী বৌদির প্রহরাধীনে! মৈনাকের তৈরী হওয়ার প্রেক্ষাপটে সিকিমের বাচ্চাগুলোর কথা ভাবলে মনে হয়, ওদের বোধ হয় কোন ভবিষ্যৎ নেই। আবার ওদের লেখাপড়ার শেখার আদতের নিরিখে মৈনাককে দেখলে মনে হয়, সে কত বন্দী, পড়ার চাপে ভীষণ ভারাক্রান্ত, তাই না!

এই পড়ার চাপের প্রসঙ্গে অমূল্যবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। ওনাদের সাথে আমাদের পারিবারিক বন্ধুত্ব। সেদিন সকালে বাজার যাচ্ছি। স্থানীয় একটি সরকারী নামী স্কুলের সামনে দেখলাম বহু লোকের লাইন। ছাত্রভর্ত্তির ফরম দেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমাদের অমূল্যবাবু লাইনে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই বললেন, "ভোর রাত থেকে লাইন দিয়েছি। তাতেও প্রায় তিনশ লোকের পিছনে।" কথাপ্রসঙ্গে জানলাম ওনার সাড়ে পাঁচ বছরের ছেলে আকাশকে স্কুলে ভর্ত্তির জন্যই এই চেষ্টা এবং ওনার স্ত্রীও একই কায়দায় আর একটা স্কুলের লাইনে দাঁড়িয়েছেন। এই দুটো স্কুলের ফর্ম নিয়ে স্বামী-স্ত্রী আবার ছুটবেন অন্য দুটো সরকারী স্কুলের ফর্ম সংগ্রহ করতে। আজকের লক্ষ্যমাত্রা চারটে ফর্ম। আগামীকাল আরও চারটে। ব্যাস্ তাহলেই কাছাকাছির সব স্কুল কভার হয়ে যাবে।' ওনার কথায়, 'লটারি হবে তো, তাই যত বেশী অ্যাপ্লাই করা যায়, তত চান্স বেশী।' এগুলো সব নাকি বাংলা মিডিয়ামের জন্য। অমূল্যবাবুর মতে বাংলা মিডিয়ামের এই গুটিকয়েক সরকারী স্কুল বাদ দিলে বাকি সব স্কুল, বিশেষ করে সরকারী সাহায্যপুষ্ট স্কুলগুলি নাকি বোগাস্, কিস্‌সু হয় না! এর সাথে সাথে ওনারা চালিয়ে যাচ্ছেন আকাশকে ইংরাজী মিডিয়াম স্কুলে ভর্ত্তির প্রচেষ্টা। দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার নামী দামী স্কুলগুলির

বেশীরভাগই তো 'থ্রি-প্লাস'এবং 'ফোর-প্লাস' বয়েসে ঢুকিয়ে নেয়। তখন রঙ চেনা, ফুল, ফল, পাখী প্রভৃতির নাম বলতে পারা, ইংরাজী ছড়া আওড়ানোর পরীক্ষা দিতে হয়। সেটা অপেক্ষাকৃত সোজা। আসলে পরীক্ষা হল বাবা-মার সামাজিক স্ট্যাটাস্ ও আর্থিক সংগতির। সেটা অমূল্যবাবুর আছে। যেকোন ভাবেই হোক্, তিন বছর ও চার বছরে ছেলেকে ভর্ত্তি করানোর সুযোগ ওনার নষ্ট হয়েছে। তাই এবছর আর কোনভাবেই মিস্ করতে চান না। অ্যাডমিশন্ টেষ্টের জন্য আকাশকে বিশেষ ধরণের কোচিং-এ ভর্ত্তি করেছেন। জেনারেল নলেজের জন্য ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া পাড়ার একটি স্মার্ট ছেলেকে রেখেছেন। একটা ইংরাজী মিডিয়াম স্কুলে কিছুটা নাকি হয়েও গেছে। ডোনেশনের ব্যাপারে একটু আটকাচ্ছে। স্কুলটা তত ভাল নয় বলে অমূল্যবাবু গা করছেন না। অপেক্ষা করছেন অন্যান্য স্কুলগুলোতে কি হয়, তার জন্য! বেচারা আকাশ! প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার আনুষ্ঠানিক শুরুর আগেই তার বেদম অবস্থা! স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে চাপের ঠেলায় তার অবস্থার খোঁজ কেই বা রাখবে? অমূল্যবাবু কি ঠিক পথে এগুচ্ছেন ছেলের শিক্ষার ব্যাপারে?

The cases of depressed students committing suicide after the publication of examination results are mounting without any redress. This suicidal tendency stems from frustration in students caught in a feverish rat race. Their parents who have great expectations about their future are mounting pressure on them for their personal wish fulfilment. They are certainly guilty of denying the students their fundamental right to life and liberty and cornering them to commit suicide.– – দৈনিক সংবাদ পত্রে পাঠকের মতামত বিভাগে শ্রী কার্তিক ব্যানার্জী। The Statesmen. 31.07.2000

যদি ভুল পথেই যান, ঠিক পথটা কেমন? আর কে বলে দেবে সেটাই ঠিক! প্রাথমিক স্তরে স্কুলে ভর্তির পরীক্ষায় প্রাইভেট টিউশনের প্রসংগে উত্তর কলকাতার এক আত্মীয়ের কথা মনে পড়ে গেল। ওনাদের বাস উত্তর কলকাতার প্রায় প্রান্তদেশে। যমজ সন্তান। ফুটফুটে ছেলেদুটির বয়স এই পাঁচ ছুঁই ছুঁই। তিন বছর বয়েস থেকেই ওরা একটা স্থানীয় কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ে। মাঝে মাঝেই শুনি স্কুল থেকে আসার পথে ওরা নাকি ঘুমিয়ে পড়ে। ওদের বাড়ীর কাছাকাছি রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটা খুব নামকরা বাংলা মিডিয়াম স্কুল আছে। তাদের প্রাথমিক বিভাগে ভর্ত্তির পরীক্ষা ভীষণ শক্ত। আমার আত্মীয়ের লক্ষ্য ঐ স্কুলে ছেলে দুটিকে ভর্ত্তি করা। এইজন্য তাদের এখন একটা কোচিং-এ দিয়েছেন। ঐ স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষক 'ভীষণ যত্ন করে' আরও কয়েকটি বাচ্চার সাথে সপ্তাহের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে শিশু দুটিকে তিনচার ঘন্টার বিশেষ তালিম দেন। দক্ষিণা পাঁচটি কি ছয়টি শতটাকার নোট! পাঁচ বছরের শিশুগুলি শেখে শব্দার্থ, বাক্যগঠন, বিপরীতার্থক শব্দ, ভিন্নার্থক সমোচ্চারিত শব্দ, শূন্যস্থান পূরণ, কবির নাম সহ বিভিন্ন কবিতার প্রথম দশ লাইন লিখন, প্রভৃতি। এছাড়াও আছে গণিতের প্রায় সমমানের প্রশিক্ষণ সম্ভার। একদিন সক্ষাতে বাচ্চাদুটিকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম," হ্যাঁরে, তোরা তো পেনসিলে লিখিস্, এত লেখা লেখি করতে আঙুলে লাগে না?" চটপট দুজনেই উত্তর দিয়েছিল,"খুব লাগে, ভীষণ ব্যাথা করে। কিন্তু না লিখলে স্যার বকেন, তাই লিখি।" শিশুদুটির সাথে আমার কথোপকথনের টুক্‌রো হয়ত আমার আত্মীয়ের কানে গিয়েছিল। সে তাই বলে ফেলল, আমি একদিন স্যারকে বলেছিলাম পড়ানোর সময় একটু কম করার জন্য। বলেছিলাম চাপও একটু কমাতে। এর উপর ওদের ক্লাসের হোমটাস্কও তো আছে। শুনে স্যার বললেন, ঐ স্কুলে পড়ার তো বড্ড চাপ মা। এখন থেকে ভিতটা তৈরী না হলে পরে ধকল সহ্য করতে পারবে না। চাপ দেওয়াটা ওদের ভালর জন্যই যে!

Teach him. if you can,
the wonder of books.....
But also give him quiet time
to ponder the eternal mystery
of birds in the sky,
bees in the sun,
and flowers on a green hillside

'Abraham Lincoln's Letter to his son's teacher' এর অংশবিশেষ। The Statesman, 05.01.1999 -এ প্রকাশিত শ্রী বাসব চৌধুরীর 'Abetting teenage trauma'য় উদ্ধৃত।

দক্ষিণ শহরতলীর ট্রামলাইন শেষ হয়ে গেছে যে ডিপোয় পুবদিকের রেললাইনের পাশে, তারই ধার ঘেঁসে একটা সরকারী সাহায্যপুষ্ট বাংলা মিডিয়াম স্কুলের হেডমাষ্টারমশাই আমার বেশ চেনা, আমরা হাওড়ার একই গ্রামের বাসিন্দা। সেইসূত্রে ওনার কাছে সম্প্রতি যেতে হয়েছিল। আর্জি, আমার ট্রান্সফার নিয়ে আসা সহকর্মীর ছেলেকে ওনার স্কুলে ভর্ত্তি করানোর।

মাঝপথে ভর্ত্তি? নামিদামী স্কুলে এককথায় অসম্ভব! যতই চাকরীতে সরকারি তক্‌মা থাক না কেন! খরচপানি করেও হচ্ছিল না। অগত্যা ওনার শরণাপন্ন হওয়া ! সেটা উনি বুঝতেই পেরেছিলেন। আমার স্কুলে আপনাদের সোসাইটির ছেলেরা আসে না। ক্লাসঘর, বিজলী, টেবিল, চেয়ার , বেঞ্চ, মাসকাবারে বেতন পাওয়া শিক্ষক সবই আছে, শুধু নেই ছাত্র। যারা আসে তাদের বেশীর ভাগই বস্তির ছেলেমেয়ে। এদের সাথে আপনার সন্তান শিক্ষালাভ করবে? তাছাড়া আমাদের মিডিয়ামও বাংলা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী শিক্ষাক্রমে পড়ানো হয়, ছেলেমেয়ে একসাথে পড়ে। বাংলায় লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলের ভবিষ্যত নষ্ট করবেন? ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত আর পাঁচটা বাঙালীর মত সাধারণ দর্শন শিক্ষক মহাশয়ের সরল প্রশ্নে আমার সহকর্মী ভিতরে ভিতরে বোধহয় উত্তেজনা বোধ করে থাকবে। কিংবা হয়তা সে এখনও ততটা মেকানাইজড্ হয়ে উঠেনি। ফস্ কর বলে ফেলল," স্যার, স্কুল মানে তো সেই জায়গা যেখানে সমাজের সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ লেখাপড়া শিখতে আসে, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের, বিভিন্ন আর্থিক সঙ্গতির মানুষের ছেলেমেয়েদের সামাজিক মিলনক্ষেত্র তো স্যার এই স্কুলগুলি;ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান, উঁচুজাত-নীচুজাত প্রভৃতির ব্যবধান ঘোচানোর পুণ্যভূমিই তো বিদ্যালয়! পড়বে স্যার, বস্তির ছেলে-মেয়েদের সাথেই আমার ছেলে পড়বে। আর বাংলায় পড়ার কথা বলছেন? আমরা বাংলা মিডিয়ামে পড়ি নি? আমরা উচ্ছন্নে গেছি? সত্যেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা বাংলায় পড়েন নি? হয়ত কিছুটা নাটুকে শোনাচ্ছে, তবু স্যার, আপনাকে বলছি, ছোট ছোট দুধের বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখানোর নামকরে যা চলছে, তা এককথায় অত্যাচারেরই নামান্তর!" বুঝলাম ছেলেকে ভাল স্কুলে অনেক চেষ্টা করেও ভর্ত্তি করাতে না পেরে আমার সহকর্মীর বুকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে! পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য বললাম, একটা বছর অন্ততঃ ব্যবস্থা করে দিন, তারপর দেখা যাবে। আমার সহকর্মীর কথায় হেডস্যারের মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে মৃদু ঝঙ্কার লেগে থাকবে হয়ত। বললেন," আমদের সময়েও লেখাপড়া ব্যাপারটা এত নিয়মনির্ভর পেশাদারী অভ্যাসের শিকার হয়ে ওঠে নি। গাছের পাঠ তখন এখনকার মত বইনির্ভর ছিল না। অনেক ছেলেই গাছ চিনত, গাছে চড়ত, গাছ তাদের খেলার সাথী ছিল। পুকুরে তারা সাঁতার কাটত, মাছ ধরত, বিভিন্ন পশু, পাখী, মাছ, কীট পতঙ্গের সাথে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। শিক্ষায় প্রকৃতির ভূমিকাটা ছিল তখন বড়। স্কুল বলতে তখন শুধু ইট-কাঠ লোহার আয়োজন বোঝাত না। তার সাথে থাকত খেলার মাঠ, তাতে থাকত গাছগাছালির সমাবেশ। এখন সবটাই তো ব্যবসায়িক উদ্যোগে পরিণত হয়েছে।" মনে পড়ল দিল্লীর নয়ডায় থাকা আমার এক বন্ধুর কথা। ওখানে স্কুল গড়ে ওঠার প্রারম্ভে থাকে সুন্দর ডিজাইনের একটা বাড়ীর প্রদর্শন। যে বাড়ী যত সুন্দর, তার বেতনও নাকি তত বেশী। দু-তিন শিফ্‌টে অনেকটা কারখানার কায়দায় স্কুলগুলি চলে। গাছগাছালি ভরা মাঠের সমাবেশ মানে বেশী খরচ, মুনাফায় কম্‌তি। অতএব!

.....The (imaginary) school could acquire a plot of land.....to make it available to the students to work on. They could turn the soil, sow seeds, water young plants, nurture them and see them bear fruits and flowers..... How about a museum room or at best a museum shelf in the school? It can exhibit collections of local artefacts, agricultural and industrial, of handicrafts, soils, stones etc., all collected by the students themselves. An aquarium may well become another laboratory for observation and experimentation on aquatic life.....(in a terrarium) the students would surely love to watch oysters, reptiles, earthworms, ants, amphibians..... They (students) could bring samples of water and focus on a drop of it with a simple microscope..... the microbes responsible for waterborne diseases would assume real significance.

শিক্ষায় পরিবেশ পরিচিতি প্রসংগে Close to Nature : Environmental Awarness From Bottom Up – – অধ্যাপক রবীন মজুমদার। The Statesman, 31.5.99

অফিসে থেকে বাড়ী আসার পথে পড়ে পশ্চিমমুখী চলে যাওয়া রেললাইনের কোল ঘেঁসে ঘিঞ্জি বস্তিগুলি। পড়ন্ত বিকালে প্রায়ই সেখানে দেখি বস্তীর ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। একদিন দেখলাম, রেললাইন ও বস্তির ঘরগুলির ফাঁকে একচিল্‌তে জমিতে ছোটরা ভাঙা বাঁশ ও কাঠের টুক্‌রো জড়ো করে বেড়া দিচ্ছে—নিশ্চয় উদ্দেশ্য বাগান করা। ঠিক তাই ! পরের দিন দেখি গাছের চারা পোঁতার কাজ চলছে, গাঁদা, মাধবী-লতা আরও কি সব; তারপর নিয়মিত জল দেওয়া হল, পরিচর্যা হল। কালক্রমে গাছে

কুঁড়ি ভরে এল। ফুল ফুটল। বাচ্চারা কি খুশী। গাছগুলো, ফুলগুলো যেন ওদের খেলার সাথী, আত্মার আত্মীয়! বোধ হয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের বাড়াবাড়ির মধ্যে শিশুগুলো আসে নি। তাই তাদের মধ্যে প্রকৃতির কাছাকাছি আসার আগ্রহ এতটা প্রবল রয়েছে। আমাদের আবাসন কমপ্লেক্সের প্রায় সব কচিকাঁচারাই তথাকথিত নামিদামী স্কুলে পড়ে। কমপ্লেক্সের মধ্যেই রয়েছে বিরাট প্রাঙ্গন। কিন্তু কোনদিন কোন ছেলে বা মেয়েকে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে বৃক্ষরোপণ পর্ব পালন করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। স্কুলের লেখাপড়ার ভীষণ চাপ গাছগাছালির প্রতি মনোযোগী হওয়ার আকাঙ্খাকে কি তাহলে শুষে নিচ্ছে!

জীবনচারণের স্বাভাবিক পরিবেশে বাস্তবমুখী হাতে কলমে (শিশুকে) শিক্ষা দেওয়ার একটি প্রচেষ্টার উল্লেখ এ প্রসংগে না করে পারছি না। শহরের একটি ছোটছেলের বাবা-মা দু'জনেই চাকরী করেন। স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা সবে তার শুরু হয়েছে। সকালবেলা স্কুল। বাবা-মার অনুপস্থিতিতে তার দেখাশুনার দায়িত্বে আছেন এক বৃদ্ধা মহিলা। তিনি খুবই গরীব, নিরক্ষর এবং প্রায় নিঃসহায়। কালক্রমে বৃদ্ধা শিশুটির ঠাকুমার স্থান নিয়ে নিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কাহিনী শোনান, তাঁর গরীব গ্রাম্যজীবনের গল্প বলেন। বর্তমানে যে অনগ্রসর ঘিঞ্জি বসতিতে তাঁর বাস, তার নানান ঘটনা-দুর্ঘটনার কথা বলেন; ছোট শিশুর সাথে বৃদ্ধার ধীরে ধীরে সখ্যতা গড়ে ওঠে। কোন দিন আসার পথে বৃদ্ধা নিয়ে আসেন কদম গাছের ফুল সমেত ডাল পাতা; কোনদিন বা একমুঠো টগর। শিশুটি সারাদিন তাই নিয়ে খেলতে থাকে আরও খেলনার সাথে! অবসর অতিবাহিত করার তাগিদে একদিন বৃদ্ধা একটি ফেলে দেওয়া মাটির পাত্র নিয়ে আসেন, সংগে কিছু মাটি; তাতে শুকনো লঙ্কার দানা ছড়িয়ে দিয়ে জল দেন। শিশুটি খেলার ছলে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতে থাকে বৃদ্ধার কান্ড। তারপর একদিন মাটি ফুঁড়ে চারাগাছ বের হয়। বৃদ্ধা ও শিশুর কি আনন্দ! অফিস থেকে বাবা-মা ফিরতেই শিশুটি তাঁদের হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে শিশু গাছটিকে দেখাতে থাকে। ধীরে ধীরে লঙ্কাগাছ বড় হয়। শিশুটি এত দিনে জেনে গেছে, ফল শুকিয়ে বীজ করার কথা। জেনে গেছে, গাছে জল দিতে হয় সন্ধ্যার দিকে; প্রায়ই দেখা যায় বৃদ্ধার সাথে শিশুটিকে গাছে জল দিতে। এমনিকরে লঙ্কাগাছে ফুল ফোটে। তারপর তাতে একদিন ফলও ধরে। "একটু খানি গাছে, রাঙা বউ ঝোলে" বলত কি? বাবা-মাকে অফিস ফেরৎ ধাঁধায় ফেলে শিশুটি। হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে মা-বাবাকে ফলন্ত লঙ্কাটিকে দেখাতে থাকে। এমনি করেই বৃদ্ধা আপন খেয়ালে উচ্ছেগাছ করেন। বারান্দার গ্রীলের আলসের কোনাকুনিকে কাজে লাগিয়ে ভারা তৈরী করেন দড়ি বেঁধে। তার উপর ভর করে লতানে গাছের শাখা প্রশাখার বাড়বাড়ান্ত ঘটে। শাখার পত্রমূলের ফাঁক ফোকরে দেখা যায় ছোট্ট কুঁড়ি; ফোটে হলুদ রঙের উচ্ছে ফুল। শিশু বাবাকে প্রশ্ন করে, "বাবা উচ্ছে ফুলের গন্ধ কেমন?" বাবা বলে, "শুঁকেই দেখ"। শিশু উত্তর দেয়, "ফুলগুলো যে সব গ্রীলের অনেক ওধারে, কেমন করে শুঁকবো?" বাবা বলে, "বোকা ছেলে, ছিঁড়ে নাও!" অনেকটা স্বগতোক্তির মত শোনায় শিশুর স্বর, "না, ছিঁড়ব না। তাহলে উচ্ছে হবে না। এধারেও কুঁড়ি হয়েছে অনেক; তাতেও হলুদ ফুল ফুটবে; গন্ধ তখনই শুঁকে নেব।" নিরক্ষর বৃদ্ধা শিশুকে শুধু বীজের অঙ্কুরোদগম, উদ্ভিদের বিকাশ, কুঁড়ির উন্মেষ, ফুলের প্রস্ফুটন, ফলের সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাটাই দেন নি, তার সাথে দিয়েছেন উদ্ভিদকে ভালবাসার মহান উপলব্ধি। এবং তাঁর এই শিক্ষাদান এত স্বাভাবিক জীবনচারণের অভ্যস্ত ছন্দে ঘটেছে যে শিশুশিক্ষার্থী মুহূর্তের জন্যও শিক্ষার বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে নি বলেই মনে হয়। আজকের প্রাতিষ্ঠানিক শিশুশিক্ষার আয়োজনে বিষয়, শিক্ষাক্রম, পঠন-পাঠন প্রণালী, ছাত্রভর্তি, মূল্যায়ন প্রভৃতি প্রায় সব স্তরেই এমন একটা তীব্র বস্তু-সর্বস্ব, বাজার-মুখী, পেশাদারী এবং ব্যবসায়িক এ্যাপ্রোচের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা শেষবিচারে জীবন, সমাজ ও প্রকৃতি-পরিবেশের পক্ষে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে বাধ্য। □

শিশুদের সবসময় ধূলো-মাটি থেকে দূরে রেখে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পরিবেশ বড় করে তোলা একটা আদর্শ পদ্ধতি হতে পারে না। ধূলো-মাটিতে এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকে যারা শিশুদের শরীরে কিছু কিছু রোগের (যেমন অ্যালার্জি, হাঁপানি ইত্যাদি) বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। বিশেষজ্ঞদের এরকমই ধারণা। আধুনিক মায়েদের যাঁরা শিশুদের ধূলামাটিহীন পরিচ্ছন্ন পরিবেশে লালন করে চলেছেন, সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, তাঁদের ছেলে-মেয়েরাই বেশী করে এই সব রোগে আক্রান্ত হয়।

ABC-TV'র প্রচারিত অনুষ্ঠানের উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত এক সংবাদ সূত্র।

Statesman 19.07.2000

বিষয় : পরিবেশ

তৃতীয় পর্ব

সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন এবং গ্রহ-পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য রেখে যাওয়া আজকের মানুষের সামনে কঠিনতম চ্যালেঞ্জ। মোকাবিলায়, আমরা কিভাবে কি করছি বা করার চেষ্টা করছি তা জানা এবং নিরন্তর পর্যালোচনা করা তাই অত্যন্ত জরুরি। একাজ শুধু পণ্ডিত বিশেষজ্ঞের নয়, আপামর জনসাধারণেরও। দৃষ্টিভঙ্গিগত একপেশেমি ভুল কর্মসূচির জন্ম দিতে পারে এবং অপরিবর্তনীয় ক্ষতিও করতে পারে। এসব কথা মাথায় রেখে 'বিষয় পরিবেশে'র অবতারণা। ইতিমধ্যে প্রকাশিত প্রথম দুটি পর্বের রচনা অবলম্বনে **পরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাপ** *শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় পরিবেশ আইনগুলির পরিচিতি ও পর্যালোচনা তৃতীয় পর্বের বিষয়বস্তু। যে কেউ এ বিভাগের জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। মতামত, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর খবরাখবর, টীকা সমীক্ষাদিও প্রকাশের জন্য সাদরে বিবেচিত হবে।*

স. ম. বিওবি

পরিবেশ আইন-কানুন : নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

[আট]

উদ্যোগীদের বিশ্বহাটে
হল্লা পাকায় এক বখাটে—

ছক-নকশা মালিকানা
দরদস্তুর বেচাকেনা
জলের জিনের বাঁটোয়ারা
করতে আসো তোমরা কারা?
উন্নয়ন? কার বা কিসের?
জীব ও জমির, বনভূমির?
গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি
পোকামাকড়, মাছ-মাছালি
আর যতো সব জীব প্রজাতি
আমরা যারা মূল আবাসী
হাজার বছর এক সাথে সব
এই আবাসে যুক্ত আছি?

বলছো কি গো, দামও দেবে?
বাজার দরের চেয়েও বেশী?
জীব-পালনী, বিষ কাটানি
জল-ভরানি, জল-নিকাশি
শহর নগর বাঁচিয়ে রাখি, নিজেও বাঁচি
এসব কিছুর দাম জানো কি?
কোন নীলামে কে চড়ালো
কোন বাজারে, সে কোন দেশী?
কেমন তোমার উন্নয়ন?
বিলোপ হবার বিলোপ করার বীজবপন?
লুঠতরাজের বিশ্বায়ন?

হল্লা মচায় বিশ্বহাটে
এক দুই তিন ... লাখ বখাটে
এ তল্লাটে, সে তল্লাটে
দালালি কি উঠবে লাটে?

আইন-কানুন : আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের নিরিখে ভারতীয় পরিবেশ আইনের পরিচিতি ও পর্যালোচনার যে প্রয়াস বিগত সাতটি কিস্তিতে করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের পর্যালোচনা ছাড়া তা অসম্পূর্ণ। কারণ

এক) সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও সদব্যবহারের প্রশ্নে পরিবেশকে ঘিরে যে নবচেতনা দেশে দেশে পরিবেশ আইন-কানুনের জোয়ার এনেছে বিগত প্রায় 30 বছর ধরে—বিশেষত, 1972-এর স্টকহোমে 'মানব

পরিবেশ' সম্মেলনের পরে—প্রকৃত অর্থেই তা একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপার।

দুই) আজকের দিনে পরিবেশ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপেরও নির্ণায়ক।

এবং তিন) পরিবেশ সমস্যা সংকটের এমন কয়েকটি দিক উন্মোচিত হয়েছে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সক্রিয়তা ছাড়া যেগুলির সমাধানের পথে এগোনো অসম্ভব।

আকারে প্রকারে নিতান্ত নগণ্য না হলেও ভারতীয় পরিবেশ আইনকানুন কেন কার্যকর হয় না, তা অনুধাবন করার জন্যও আন্তর্জাতিক অবস্থাটা বোঝা দরকার।

শিল্পের অগ্রগতি : রাষ্ট্রীয় পরিবেশ

পরিবেশ ভাবনার সূত্রপাত রাষ্ট্রীয়ভাবে—শিল্পে অগ্রণী দেশে, বিশেষ করে বৃটেন তথা ইউরোপ ও আমেরিকায়।

1842-এ এডুইন চ্যাডউইকের (Edwin Chadwick) নেতৃত্বে 'গ্রেট বৃটেনের শ্রমিকদের স্যানিটারী অবস্থা' বিষয়ক একটি রিপোর্ট তৈরী হয়। চ্যাডউইক ছিলেন 'দরিদ্র বৃটেনবাসীর আইনী সুরক্ষা' পর্যালোচনার জন্য নিযুক্ত কমিশনের সেক্রেটারী। সেজন্য এই রিপোর্টটি 'পুওর ল কমিশনের' রিপোর্ট হিসেবেই পরিচিত হয়ে গেছে। এই রিপোর্টে বলা হয় যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য 'ডাক্তার নয়: প্রয়োজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ারদের'। রিপোর্টের অন্যান্য প্রস্তাবগুলিও ছিলো প্রণিধানযোগ্য—ঘরে ঘরে পরিস্কার পানীয় জল পৌঁছে দিতে হবে, গৃহস্থালী ময়লাজল (Sewage) পৃথকভাবে পাইপের সাহায্যে শহর থেকে দূরে চাষের জমিতে ফেলতে হবে—ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে সেসময় ময়লাজল বা গৃহস্থালী যাবতীয় আবর্জনা রাস্তায় বা বাড়ীর পাশে ফেলে দেওয়া হতো। ক্রমে তা শুকিয়ে পচে উড়ে-ধুয়ে মিশে যেতো জলে বাতাসে। পুওর ল' কমিশনের সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবগুলোর সম্যক তাৎপর্য বোঝার সময় তখনও আসেনি, কারণ জলবাহিত রোগ সম্পর্কে তখন খুব অল্পই জানা ছিলো। এর কয়েকবছরের মধ্যে উইলিয়াম বাড (William Budd) ময়লাজলের (Sewage) সংস্পর্শে আসা জল থেকে যে টাইফয়েড হয় তা প্রমাণ করেন। এসবের ফলশ্রুতি 1848-এর ইংলন্ডের 'ন্যাশনাল পাবলিক হেল্‌থ অ্যক্ট'—এক অর্থে পৃথিবীর প্রথম পরিবেশ আইন। আশ্চর্যের হলেও সত্যি, এরও কয়েকবছর পরে (1854) জন স্নো (John Snow) ময়লাজল ও কলেরার সম্পর্ক আবিস্কার করেন। রোগ ও জীবাণুর সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় লুই পাস্তুরের যুগান্তকারী কাজকর্ম (18860-1880) শুরু হয় এরও কয়েক বছর পরে।

জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারদের তুলনামূলক ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকলেও পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে একের পর এক গড়ে উঠতে থাকে ওয়াটার ওয়ার্কস। উল্লেখ্য যে কলকাতার জন্য পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসও স্থাপিত হয় এই সময়েই (1858)। 1876-এ ইংলন্ডে প্রণীত হয় 'রিভার পলিউশন অ্যাক্ট'—যা সরাসরি নদীতে ময়লাজল (Sewage) ফেলা অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করলো।

আমেরিকাতেও প্রায় সমান্তরালভাবে একই রকমের ভাবনা-চিন্তার প্রসার ঘটতে থাকে। 1880 সালের মধ্যেই আমেরিকায় ছশোর মত ওয়াটারওয়ার্কস তৈরী হয়ে যায়। ব্রিটেনের মতোই গৃহস্থালির ময়লাজল এবং শিল্পনির্গত বর্জ্য জলের বিহিত করা নিয়ে বিভিন্ন কমিটি কমিশন নিয়োজিত হতে থাকে। ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার বিতর্কও তীব্র আকার নেয়।

এরই পাশাপাশি, দুটি দেশেই বাড়ীতে, শিল্পে এবং রেল যোগাযোগে ক্রমবর্ধমান কয়লা ব্যবহারের ফলে শহরাঞ্চলে ধোঁয়ার প্রকোপ বাড়তে থাকে। 1843 সালেই তৈরী হয় 'ম্যানচেস্টার অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রিভেনশন অফ স্মোক'। ব্রিটিশ সরকার 'ফগ অ্যান্ড স্মোক কমিটি' নিযুক্ত করে 1880 তে। 1905 সাল নাগাদ 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রিভেনশন অফ স্মোক' নামের একটি সংস্থাকেও আসরে দেখা যায়। ব্রিটেন ও আমেরিকাতে 'স্মোক ন্যুইস্যান্সের' বিরুদ্ধে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, আইনও প্রণীত হয়। এমনকি কলকাতা (1905) এবং বোম্বাইও (1912) পায় 'স্মোক ন্যুইসান্স অ্যাক্ট' নামের প্রাদেশিক আইন।

1914 সালে শিল্পের জলীয় বর্জ্যের শোধনের 'সক্রিয় কর্দম' (Activated Sludge) পদ্ধতি আবিস্কৃত হবার পরও এটির প্রয়োগ তেমনভাবে হয়নি অনেকদিন, যদিও আজকের দিনেও শিল্পের জলীয় বর্জ্যের শোধনে এটি অন্যতম প্রধান একটি পদ্ধতি।

জল ও বাতাসের দূষণ ও তার প্রতিকার নিয়ে বৃটেন ও আমেরিকার প্রায় সমান্তরাল এই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এরপর খানিকটা স্তিমিত থাকে। সম্ভবতঃ দুটি বিশ্বযুদ্ধ এপথে কিছুটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

1952 সালের বিখ্যাত 'লন্ডন স্মগে'র ঘটনায় নানাভাবে প্রায় চার হাজার মানুষের মৃত্যুর পর 1955-য় আমেরিকা আনলো

'এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল অ্যাক্ট' আর পরের বছরেই ইংলন্ডে চালু হলো 'দি ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট'। 1948-এই আমেরিকায় 'ফেডারেল ওয়াটার পলিউশন-কন্ট্রোল অ্যাক্ট' চালু হয়ে গেছিল।

প্রকৃতিকে সুরক্ষিত (Protected) ও উৎপাদনশীল রাখলে সম্পদও সংরক্ষিত (Resource Conservation) থাকবে—এই নীতিরও প্রকাশ ঘটে ইউরোপ এবং আমেরিকায় উনিশ শতকেই। পাখি মাছ বন ও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা ও সংরক্ষণ গুরুত্ব পেতে থাকে। 1889 তে বৃটেনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সোসাইটি ফর দি প্রোটেকশন অফ বার্ডস'। উপনিবেশের দিকেও দৃষ্টি প্রসারিত হয় : 1990 তে 'অফ্রিকার বন্য প্রাণী, পাখি ও মাছ সুরক্ষার' জন্য কনভেনশন হয় লন্ডনে ; 1903 এ বৃটেনে গড়ে ওঠে 'সোসাইটি ফর দি প্রিজারভেশন অফ ওয়াইল্ড ফনা (Wild fauna) অফ দি এম্পায়ার'।

অরণ্যের (forest) রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের বিষয়ে প্রথাগত চর্চা ইউরোপে সর্বাগ্রে শুরু করেছিলো জার্মানী। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জার্মানীতে প্রশিক্ষিত ফরেস্ট অফিসাররা বৃটেন ও আমেরিকায় রীতিমতো সমাদৃত হতেন। 1847 -এ বোম্বাইতে এবং 1856 তে মাদ্রাজে ফরেস্ট কনজারভেটররা নিযুক্ত হন সরকারী আয় বাড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে। 1846 তে ডিট্রিশ ব্রানডিস ভারতের 'ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ ফরেস্ট' হিসেব নিযুক্ত হন। ব্রানডিস ছিলেন জার্মান এবং লর্ড ডালহৌসীর আত্মীয়। তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম অরণ্য আইনের (1865) হোতা। আর বনবাসী ভারতীয়দের দুর্দশা বঞ্চনারও সূত্রপাত সেই থেকে।

1864 তে জর্জ পারকিনস মার্শ (Georage Perkins Marsh) আমেরিকায় প্রকাশ করেন 'ম্যান অ্যান্ড নেচার' শীর্ষক একটি বই যা পরবর্তী কয়েক দশক ধরে আমেরিকানদের প্রেরণা দিয়েছে। সুরক্ষাবাদী (Protectionists) এবং সংরক্ষণবাদীদের (Preservationists) বিতর্ক চলতে থাকে। সুরক্ষাবাদীরা অরণ্য বা প্রকৃতিকে শিক্ষা বা নান্দনিক কারণ ছাড়া ব্যবহার হতে দিতে নারাজ। আর সংরক্ষণবাদীরা চান নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। 1872 -এ আমেরিকান কংগ্রেস পৃথিবীর প্রথম ন্যাশনাল পার্ক—ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক—তৈরী অনুমোদন করলো। বিশ শতকের প্রথম দশকে ইউরোপের অনেক দেশেই প্রকৃতি সুরক্ষার সমিতি গড়ে উঠেছিলো। 1909 তে আমেরিকায় গড়ে উঠলো 'ন্যাশনাল কনজারভেশন অ্যাসোসিয়েশন', আর 1913 তে বৃটেন পেলো 'ব্রিটিশ ইকোলজিক্যাল সোসাইটি'। ...

পরিবর্তিত পরিস্থিতি : আন্তর্জাতিক পরিবেশ

প্রাক-বিশ্বযুদ্ধ পরিবেশ যে প্রধানত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছিলো—এবং বিশেষভাবে শিল্প অধ্যুষিত দেশে, তা বোঝাবার জন্য উপরে সামান্য কিছু তথ্য দেওয়া হলো মাত্র। **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবী কিন্তু আর আগের মতো রইলো না।** এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকা জুড়ে জাতীয় মুক্তির ও স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষার জোয়ার উঠলো ; বিধবস্ত ইউরোপ-জাপানের চাই দ্রুত পুনর্গঠন ও পুনরুত্থান, কিন্তু পুরনো ঘরাণার উপনিবেশবাদ যে আর চলবে না, তাও বুঝতে বাকী রইলো না ; একে একে সে সব উপনিবেশ ছেড়ে দেবার পালা। জাতিপুঞ্জের (United Nations) অভ্যুদয় ঘটলো ; পরতে পরতে উন্মোচিত হতে লাগলো নতুন আন্তর্জাতিক সমীকরণ। বিজ্ঞান-কারিগরীর উদ্দাম ছোটায় পড়লো বাধা ; হিরোশিমা নাগাসাকি তাকে দাঁড় করালো মূল্যবোধের প্রশ্নের মুখোমুখি। **পৃথিবীর ইতিহাসে দ্রুততম পথ পরিক্রমার প্রায় আড়াই-দশক উত্তীর্ণ হলো এক নতুন অধ্যায়ে** 1972-এর স্টকহোমের মানব-পরিবেশ সম্মেলনের (United Nations Conference on Human Environment) মধ্য দিয়ে। **পরিবেশ জাতীয়তার গণ্ডী অতিক্রম করে হয়ে গেলো বিশ্বমানবীয়। সাম্যের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধারণা ইকোলজিভিত্তিক নতুন বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য খুঁজে পেলো। সূচনা হলো আন্তর্জাতিক পরিবেশ কর্মকান্ডের,** নতুন নীতির ও নতুন প্রোগ্রামের। দেশে দেশে তারই অনুসরণে তৈরী হতে লাগলো নতুন দপ্তর, নতুন সংগঠন, নতুন আইনকানুন বিধিনিয়ম, পুরনো কিছু কিছু আইনকানুন দ্রুত সংশোধিত হতে লাগলো।...

আর কুড়ি বছর ধরে পথচলার শেষে আরও শক্ত পোক্ত ও সংহত হয়ে, প্রভাবের ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করে আত্মপ্রকাশ করলো 1992-র রিও-ডি-জেনিরোর **পরিবেশ ও উন্নয়ন** (United Nations Conference on Environment and Development) শীর্ষক বিশ্বসম্মেলনে। **টেকসই উন্নয়ন** (Sustainable Development) হলো নতুন ক্যাচওয়ার্ড (Catchword) ; উৎপাদন বিকাশ বন্টন বাণিজ্য বিজ্ঞান-তো অঙ্গীভূত হলোই, অসাম্য, অত্যাচার নিপীড়ন, বঞ্চনা শোষণের অবসানেরও প্রতিশ্রুতি মিললো। বিশ্বযুদ্ধের অবসানের ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও এর আওতায় এসে গেল।

তথ্য হিসেবেই আপাতত এগুলি উল্লেখ করা হলো, অতি অল্প কথায় এর ব্যাখ্যা দিতে গেলে তা শুধু বিভ্রান্তিই সৃষ্টি

করবে। অথচ আমাদের বর্তমান অবস্থান বোঝা এবং ইতিকর্তব্য স্থির করার জন্যও এ বিষয়ে আরও গভীরে যাওয়াটা জরুরী। তাই অদূর অতীতের এই ইতিহাসের একটু বিশদ আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখে আসুন আমরা পরিবেশ আইনকানুনের দিক থেকে ভারতের সঙ্গে বিশ্বপরিস্থিতির তুলনা সেরে নিই।

রাষ্ট্রীয় → আঞ্চলিক → বিশ্ব → রাষ্ট্রীয়

পরিবেশ আইনকানুনের ব্যাপকতা, স্পষ্টতা ও প্রয়োগদক্ষতার বিচারে আজকের দিনের সফলতম উদাহরণ হিসেবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (USA) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) কেই চিহ্নিত করতে হয়। নিউজিল্যান্ড ও কানাডাও যথেষ্ট অগ্রণী, কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই প্রভাব পরিচিতির বিচারে তারা আড়ালে পড়ে যায়। 1972-এ ইউরোপ ও আমেরিকার যে প্রস্তুতি ছিলো, তা আর কারও ছিলো না। অনেকেই (যেমন ভারত) তো শুরুই করলো প্রায় শূণ্য থেকে। অথচ 1970-এই ব্রিটেন নিযুক্ত করেছে 'রয়্যল কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড পলিউশন', একই বছরে বৃটিশ সরকার তৈরী করেছে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট। আর ঐ 1970 এই আমেরিকা সূচনা করেছে তার পরিবেশ নীতি নির্ধারণ ও রূপায়নে নেতৃত্ব দেবার শক্তিশালী দপ্তর ইউ. এস. এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সী' (USEPA)। স্টকহোম ঘোষণাপত্র—যা অনেক সময় 'ম্যাগনা কার্টা অন হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট' (Magna Carta on Human Environment) হিসেবে অভিহিত হয়েছে—স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত হবার পরেই তারা হাল ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ইইসি (EEC) থেকে ই ইউ (EU) : রাষ্ট্রীয় পরিবেশ থেকে আঞ্চলিক যৌথ পরিবেশ

অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশগুলি 1958 সালেই চুক্তিবদ্ধ হয়ে (রোম চুক্তি) তৈরী করেছিল একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠী—ইউরোপীয় ইকোনমিক কমিউনিটি, সংক্ষেপে ইইসি ; মূল লক্ষ্য-নিজেদের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে অবাধ বাণিজ্য গড়ে তোলা। রোম চুক্তিতে পরিবেশের কোন উল্লেখ পর্যন্ত ছিলো না। কিন্তু বাণিজ্যের স্বার্থেই 1967 তে একবার এবং 1970-এ আর একবার দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারী করতে হয় ইইসিকে। প্রথমটি ছিলো 'বিপজ্জনক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ, প্যাকেজিং ও লেবেলিং' সম্পর্কিত (তেজস্ক্রিয় বা বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য ভয় ও সন্দেহ উদ্রেককারী!) এবং দ্বিতীয়টি ছিলো মোটরগাড়ী নিঃসৃত গ্যাস ও শব্দ সংক্রান্ত। স্টকহোম সম্মেলনে ইইসি হিসেবে নয় পৃথক পৃথকভাবেই দেশগুলি অংশগ্রহণ করেছিলো। কিন্তু অতি দ্রুত, 1973-এই ইইসি গ্রহণ করলো একটি ত্রিবার্ষিক সাধারণ পরিবেশ কর্মসূচী, এই প্রক্রিয়াই আজও অব্যাহত। ইইসি শুধু 'অর্থনৈতিক গোষ্ঠী' থাকলো না, 1986 তে আনুষ্ঠানিকভাবেই হয়ে গেলো শুধু ইউরোপীয় কমিউনিটি বা ই সি (EC)। আর 1987 তে রোমচুক্তি বাতিল করে গৃহীত হলো অখন্ড ইউরোপীয় আইন (Single European Act বা SEA)। এতে সংযোজিত হলো নতুন একটি গোটা অধ্যায়—পরিবেশ। অভিন্ন এক পরিবেশ নীতি এবং গুণমাণ ও মাত্রা সম্পর্কে অভিন্নতার লক্ষ্যে চালিত হলো ইসি। 1992-এর মধ্যে ইইসি/ইসি চালু করেছে 200 রও বেশী সংখ্যক পরিবেশ নির্দেশিকা। 1993 তে রিও সম্মেলনের পরের বছরই ইসি আবার নাম পরিবর্তন করে হয়ে গেলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ই ইউ (EU)। 1999 তে আংশিকভাবে চালুও হলো অভিন্ন মুদ্রা—ইউরো। বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো। বাণিজ্য ও পরিবেশের সম্পর্কের পরিবর্তনের ইউরোপীয় বৃত্ত।

চুক্তি অনুযায়ী পরিবেশ সংক্রান্ত দুধরণের আইনী প্রক্রিয়া ই ইউ করতে পারে—রেগুলেশন (Regulation), যা ইউনিয়নভুক্ত প্রতিটি দেশেরই সাধারণ আইন হিসেবে গণ্য হয়, এবং নির্দেশিকা (Directives), যা সদস্য দেশগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে নির্দেশ দেয়, পদ্ধতি-প্রকরণে সদস্য দেশের স্বাধীনতা থাকে। ইউনিয়নের রেগুলেশন-নির্দেশিকা মেনে সদস্য দেশ নিজেদের দেশের জন্য পৃথক আইনও করতে পারে। যেখানে ইউনিয়নের রেগুলেশন বা নির্দেশিকা নেই সেরকম ক্ষেত্রেও সদস্য দেশ আইন করতে পারে। প্রয়োজনে ই ইউ নির্দ্দিষ্ট বিধি ও মাত্রা আরও কঠোর করতেও পারে কোন সদস্য দেশ, কিন্তু শিথিল করতে পারবে না। বস্তুত ই ইউ ভুক্ত দেশগুলির অনেকেরই আগে থেকেই কিছু কিছু আইন ছিলোই। উত্তর ইউরোপের দেশগুলিতে, বিশেষত জার্মানী, ডেনমার্ক ও হল্যান্ডে পরিবেশ আইনকানুনের ভিত্তি ও ঐতিহ্য বেশ সুদৃঢ় ছিলো। ই ইউ এর অভিন্ন পরিবেশ-লক্ষ্য নির্ধারণে এই দেশগুলির ভূমিকাই ছিলো মুখ্য। বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে জার্মানীর নিয়মাবলী এবং মাননির্দেশক মাত্রাই (German TA Luft Air Quality Standards)

অনুসরণ করেছে ই ইউ। কঠিন বিপজ্জনক বর্জ্যের শোধন ও বিধান (Treatment and disposal) সম্পর্কেও ডেনমার্ক, হল্যান্ড এবং জার্মানীই ই ইউ এর পথপ্রদর্শক।

বিশ্বপরিবেশ : আমেরিকান কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব

1972-এর আগেই আমেরিকায় জাতীয় পরিবেশ সুরক্ষা দপ্তর ই পি এ (EPA) তৈরী হলেও এবং জল-দূষণ, বায়ু দূষণ, কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কয়েকটি মূল আইন প্রণীত হলেও, 1972-এর পরেই আমেরিকা নতুনভাবে জেগে উঠল। ইপিএ'ই আমেরিকার পরিবেশ কর্মকান্ডের মূল নিয়ন্তা। আইনের প্রথম খসড়া তারাই তৈরী করে এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বারা আভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা করা হয়। বৈজ্ঞানিক কারিগরী ও আইনী পর্যালোচনার পর সংশোধিত প্রস্তাবিত খসড়া আগ্রহী সাধারণ মানুষ এবং বিজ্ঞানীমহলের মতামতের জন্য 30 থেকে 120 দিনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। প্রয়োজন মনে করলে আগাম নোটিশ দিয়ে আনুষ্ঠানিক মতামত যাচাই এর ব্যবস্থাও করা হয়। সংগৃহীত মতামতগুলিকে বিচার বিবেচনা করে খসড়া আইনকে আবার সংশোধন করার পর তা কেন্দ্রীয় নথিভুক্ত (Congressional Federal Register বা CFR) করা হয়। CFR-এ নথিভুক্ত হবার পরও সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধির সংশোধন-পরিবর্তন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যায়।

ই পি এ প্রণীত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিবেশ আইনকানুন আমেরিকার সমস্ত রাজ্যে (State) প্রযোজ্য, যদিও কোন রাজ্য ইচ্ছে করলে বিধিনিয়ম কঠোরতর করতে পারে। বস্তুত, ক্যালিফোর্ণিয়া কোন কোন ব্যাপারে ই পি এর পথপ্রদর্শক।

1972-এর পর বেশ দ্রুত পরম্পরায় ঘটা কিছু দূষণ-দুর্ঘটনা পরিবেশকে বিশ্বরাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূলকেন্দ্রে ঠেলে দিতে আরও সহায়ক হয়েছে। ইতালির সেভেসোতে রাসায়নিক বিষ ছড়িয়ে পড়া (1976), আমেরিকার থ্রি মাইল আইল্যান্ডে পারমানবিক চুল্লি গলে যাওয়া (1978), ভূপালের মিক (MIC) বিপর্যয় (1984) রাশিয়ার চের্ণোবিলের পারমানবিক বিপর্যয় (1986), এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য (দ্রঃ বি ও বি ঃ জানু-জুন, 1997)। আমেরিকার লাভ ক্যানেলের ঘটনাও নজরে এলো 1974-75-এ। দীর্ঘদিন ধরে নানারকম রাসায়নিক বর্জ্য ফেলে জলাশয় খাদ ইত্যাদি ভরাট করার ফলে উত্তরকালের মানুষের দিকে ঠেলে দেওয়া পরিবেশ বিপর্যয়ের ইঙ্গিত স্পষ্টভাবেই ধরা পড়লো এতে। কানুনী মোকাবিলায় নেমে পড়লো ই পি এ : বর্জ্য ফেলে নষ্ট করা জায়গাগুলিকে খুঁজে বের করে সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য আইন প্রণীত হলো। —রিসোর্স কনজারভেশন এ্যান্ড রিকভারি অ্যাক্ট (1976) ; চার বছর পর দেখা গেল সমস্যা বিশাল, সে তুলনায় অগ্রগতি হয়েছে অতি সামান্যই। সংশোধিত নতুন আইন চালু হলো, বিরাট অঙ্কের অর্থ মঞ্জুর হলো, দ্রুত রূপায়ণের লক্ষ্যে। আইনের পোষাকী নাম আড়ালে চলে গেল, জনপ্রিয় চালু নাম হলো সুপারফান্ড (Superfund) আইন। নষ্ট হওয়া, দুষিত হয়ে পড়া জমি জায়গা চিহ্নিত করা ও পুনরুদ্ধার (Reclaimation) করার জন্য শুরু হলো দক্ষযজ্ঞ, বিজ্ঞান কারিগরীতে উদ্ভাসিত হলো নানা সংশোধন পদ্ধতি (Remediation)। কাজেই সাধারণ বর্জ্য বা বিপজ্জনক বর্জ্যের বিহিত করা, মাটির গর্তে বর্জ্য ফেলার (land filling) সুষ্ঠু নিয়ম-সতর্কতা ইত্যাদি বিষয়ে আমেরিকা অন্যদের চেয়ে এগিয়ে। বায়ুদূষণ ও বায়ুর গুণমান তথা মাত্রা নির্দেশের ক্ষেত্রেও ই পি এ আইন, বিধি ও মাত্রা নির্দেশ অনেক সম্পূর্ণ ও বিশদ।

বস্তুত 1972 পরবর্তী বছরগুলিতে আমেরিকার ই পি এ হয়ে উঠলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিশ্বপরিবেশের নিয়ন্ত্রক। এমনকি ই ইউ-ও বহু ক্ষেত্রে তাদেরই অনুসরণ করতে লাগলো। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী যে তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা প্রয়োজন, তার জন্য দ্রুত যে সব গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং যে বিপুল অর্থ, বিরাট ও বহুমুখী সাংগঠনিক পরিকাঠামো ও উদ্যোগে এগুলি ঘটিয়ে তুলতে পারে—তা দিতে পাবার মত ক্ষমতা ও তৎপরতা দেখালো আমেরিকা, ই পি এ'র মাধ্যমে। সুপারাফান্ড অ্যাক্ট-এর কথা বলা হয়েছে, আর একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাক ঃ 1948-এ প্রণীত ফেডারেল ওয়াটার পলিউশন কন্ট্রোল অ্যাক্ট, 1972 এর মধ্যে পাঁচবার সংশোধিত হয়েছিল। তবুও 1972-এই আগের আইন নতুন করে প্রণীত হলো 'ক্লিন ওয়াটার অ্যাক্ট' নামে ; সেটিও আরও তিনবার সংশোধিত হবার পর 1992-এর সংশোধনীতে 65 হাজার রাসায়নিক পদার্থকে চিহ্নিত করেছে নিয়ন্ত্রণের জন্য। নিরাপদ পানীয় জলের গুণনির্দেশ করে প্রণীত 1974 এর 'সেফ ড্রিংকিং ওয়াটার অ্যাক্ট', 1992 তে 85 প্রকার দূষক পদার্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট করেছে।

সারণী 6এ কয়েকটি ক্ষেত্রে আমেরিকা (ই পি এ), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ই ইউ) ও ভারতের প্রধান প্রধান কিছু আইনের তুলনামূলক অবস্থান নির্দেশের চেষ্টা করা গেলো।

সারণী—6

ক্ষেত্র	আমেরিকা	ইইসি/ইসি/ই ইউ	ভারত	মন্তব্য
জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ	ফেডারেল ওয়াটার পলিউশন কন্ট্রোল অ্যাক্ট,1948 ও তার সংশোধনী সমূহ ওয়াটার কোয়ালিটি অ্যাক্ট, 1965 ক্লিন ওয়াটার এ্যাক্ট, 1972 সেফ ড্রিংকিং ওয়াটার অ্যাক্ট, 1974 গ্রাউণ্ড ওয়াটার প্রোটেকশন ষ্ট্র্যাটেজি, 1984 ওয়েটল্যান্ডস রেগুলেশন, 1989 ওয়েটল্যান্ডস অ্যাকশন প্ল্যান, 1989 সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট রুলস, 1989 ইত্যাদি	সারফেস ওয়াটার ফর ড্রিংকিং, 1975 ডেঞ্জারাস সাবস্টান্সেস ইন ওয়াটার, 1976 ড্রিংকিং ওয়াটার কোয়ালিটি, 1980 গ্রাউণ্ডওয়াটার, 1980 আরবান ওয়েষ্টওয়াটার, 1991 নাইট্রেটস ফ্রম এগ্রিকালচারাল সোর্সেস, 1991 ইত্যাদি	দি ওয়াটার (প্রিভেনশন অ্যাণ্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন) অ্যাক্ট, 1974 ও তার সংশোধন সমূহ	ইউরোপীয় দেশগুলির পুরোণো আইন এবং নিজ নিজ আইন আছে, এখানে উল্লেখ করা হয় নি। 1972 পরবর্তী আইনের বিস্তৃতি লক্ষ্যণীয়
বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ	ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট, 1955 ও সংশোধনী সমূহ মোটর ভিহিকলস অ্যাক্ট, 1960 এয়ার কোয়ালিটি অ্যাক্ট, 1967 ও সংশোধনীসমূহ অ্যাসিড প্রেসিপিটেশন অ্যাক্ট, 1980 ইত্যাদি	এমিশনস ফ্রম পেট্রোল ইঞ্জিন, 1970 স্মোক ইন এয়ার, 1980 ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্লান্টস, 1984 এমিশনস ফ্রম ডিজেল ইঞ্জিন, 1988 সালফার ডাইঅক্সাইড ইন এয়ার, 1989 মিউনিসিপ্যাল ইনসিনারেশন প্লান্টস, 1989 ইত্যাদি	দি এয়ার (প্রিভেনশন অ্যাণ্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন অ্যাক্ট, 1981 ও তার সংশোধনীসমূহ মোটর ভেহিক্‌ল্‌স অ্যাক্ট, 1988	ঐ
বর্জ্যের শোধন ও বিহিতকরণ	সলিড ওয়েস্ট ডিসপোজাল অ্যাক্ট, 1965 রিসোর্স রিকভারি অ্যাক্ট ,1970 রিসোর্স কনজারভেশন অ্যান্ড	টক্সিক অ্যাণ্ড ডেঞ্জারাস ওয়েস্টস, 1978 ট্রান্সফ্রন্টিয়ার শিপমেন্ট অফ হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট, 1984	দি এনভায়রনমেন্ট (প্রোটেকশন) অ্যাক্ট, 1986 -এর বিশেষ বিধিনিয়ম	ঐ

	রিকভারি অ্যাক্ট 1976 ও সংশোধনীসমূহ কম্প্রিহেনসিভ এনভায়রনমেন্ট রেসপন্স কমপেনসেশন অ্যান্ড লায়েবিলিটি অ্যাক্ট, 1980 (সুপার ফাণ্ড অ্যাক্ট) ও সংশোধনী সমূহ সুপারফাণ্ড অ্যামেন্ডমেন্টস অ্যাণ্ড রিঅথরাইজেশন অ্যাক্ট, 1986 ইত্যাদি	হ্যাজার্ডাস ওয়েস্টস, 1991 ল্যাণ্ডডিল অফ ওয়েস্ট, 1991 ইনসিনারেশন অফ হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট, 1992 ইত্যাদি		SARA(USEPA) অনুযায়ী 1996 পর্যন্ত প্রায় 1200 বর্জ্যস্থান চিহ্নিত হয়েছ, মাত্র 100 টি স্থানের সংস্কার হয়েছে।
বিপজ্জনক রাসায়নিক	হ্যাজার্ডাস মেটিরিয়ালস ট্রান্সপোর্টেশন অ্যাক্ট, 1975 টক্সিক সাবস্ট্যান্সেস কন্ট্রোল অ্যাক্ট, 1976 অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ অ্যাক্ট, ইত্যাদি	মেজর অ্যাকসিডেন্ট হ্যাজার্ডস,1982 (সেভেসো ডিরেকটিভ) ও তার সংশোধনী সমূহ ইত্যাদি	দি এনভায়রনমেন্ট (প্রোটেকশন) অ্যাক্ট, 1986-এর বিশেষ বিধিনিয়ম মোটর ভিহিঃ অ্যাক্ট, 1998	
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ	নয়েজ কন্ট্রোল অ্যাক্ট, 1972 দি এভিয়েশন নয়েজ ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্যাপাসিটি অ্যাক্ট, 1992	কনস্ট্রাকশন প্লান্ট নয়েজ, 1979 নয়েজ ইন ওয়ার্কপ্লেস, 1982	বায়ুদূষণের অন্তর্ভূক্ত	
জীবের আবাস (Habitat)	ফরেস্ট অ্যাক্ট রেঞ্জল্যাণ্ড রিনিউএবল রিসোর্সেস প্ল্যানিং অ্যাক্ট, 1974 ইত্যাদি	কনজারভেশন অফ ওয়াইল্ড বার্ডস, 1979 ইত্যাদি	দি ওয়াইল্ডলাইফ (প্রোটেকশন) অ্যাক্ট, 1972 দি ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট, 1980	
সাধারণ ও অন্যান্য	ন্যাশনাল এনভায়নমেন্টাল পলিসি অ্যাক্ট ,1970 ফেডারেল ল্যাণ্ড পলিসি অ্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, 1976 পলিউশন প্রিভেনশন অ্যাক্ট, 1990 এমার্জেন্সী প্ল্যানিং অ্যাক্ট কমিউনিটি রাইট টু নো, 1986 ইত্যাদি	এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট, 1945 অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন অন দি এনভায়রনমেন্ট, 1990 ইকো অডিট স্কিম, 1992 ইত্যাদি	দি এনভায়ারনমেন্ট (প্রোটেকশন) অ্যাক্ট, 1986 পাবলিক লায়েবিলিটি ইনসিওরেন্স অ্যাক্ট, 1991	ভারতে সাধারণের তথ্য জানার অধিকার অত্যন্ত সীমিত

এবং নাগরিক অধিকার

পরিবেশ-দূষণ বিপদ ও ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য জানবার নাগরিক অধিকার আমেরিকা ও ইউরোপের দেশে দেশে আইনী স্বীকৃতি পেয়েছে। আইন তৈরীর পদ্ধতির মধ্যে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের খানিকটা সুযোগ আছে। বিপজ্জনক বর্জ্য সম্পর্কিত তথ্য নাগরিকরা বিশদে জানার অধিকারী। বিষপদার্থ নিয়ন্ত্রণ আইন (আমেরিকা) অনুযায়ী যে কোন রাসায়নিক পদার্থের বাণিজ্যিক উৎপাদন করতে চাইলে তার বিষক্ষমতা (toxicity) পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং সে তথ্য সাধারণে প্রকাশ করতে হবে। **1990 তে ই ইউ নাগরিকদের পরিবেশ-তথ্য জানাবার অধিকার স্বীকার করে পৃথক আইন করেছে। কয়েকটি সদস্য দেশে অনেক আগেই এরকম পৃথক আইন চালু ছিল।** যেমন বৃটেনের এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সেফটি ইনফরমেশন অ্যাক্ট, 1988। বৃটিশ এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট (1990) অনুযায়ী দুটি কারণ ছাড়া আর সব ক্ষেত্রে দূষণ ও তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যাবতীয় তথ্য জনসাধারণকে জানাবার জন্য রেজিস্টার তথা নথি দেখানোর ব্যবস্থা আছে। এই দুটি কারণ হলো—জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা এবং ব্যবসাসংক্রান্ত গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনে। আমরা দেখেছি, ভারতেও অনুরূপ ব্যবস্থার উল্লেখ আছে আইনে। কিন্তু ভারতের মতোই বৃটেন আমেরিকাতেও যে কারণকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে তথ্য গোপন করা হয় বা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং তা নিয়ে নাগরিক ক্ষোভও আছে। তবে **ভারতে নাগরিকদের তথ্য জানবার অধিকার আইনগতভাবেও অনেকটাই খর্বিত।**

ভ্রম সংশোধন

আগের সংখ্যা বিওবি'তে (অক্টো-ডিসে 1999) 'পরিবেশ আইনকানুন ঃ নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য (সাত) শীর্ষক রচনার শেষাংশে জাতীয় পরিবেশ নীতির অনুপস্থিতি শীর্ষক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, 'পরিবেশ আইনের সার্থকতা হতে পারত তাদের রূপায়ণে, আর রূপায়ণ সার্থকতা পেতে পারতো জাতীয় পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতি ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ণে। কিন্তু যদি আমাদের কোন জাতীয় পরিবেশ নীতিই না থাকে, না থাকে জাতীয় উন্নয়ন নীতি, তাহলে পরিবেশ আইনকানুও দিশাহীন ও অসংলগ্ন হতে বাধ্য'।

কিন্তু তথ্য হিসেবে ভারতের জাতীয় পরিবেশ ও উন্নয়ন নীতি না থাকার কথাটি ঠিক নয়। 1992 র জুন মাসে শ্রী কমল নাথ মন্ত্রী থাকাকালীন 'মিনিষ্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যাণ্ড ফরেস্ট' এর পক্ষে ঘোষিত হয় 'ন্যাশনাল কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি অ্যাণ্ড পলিসি স্টেটমেন্ট অন এনভায়রনমেন্ট অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্টস। অর্থাৎ সংরক্ষণ, পরিবেশ ও উন্নয়ন নিয়ে জাতীয় নীতি। এতে টেঁকসই উন্নয়নকেই লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এবং পরিবেশের সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখেই বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের পরিকল্পনা করা হবে এবং এমনকি উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারও করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়েছিল এই দলিলে। দূষণ নিবারণের জন্যও ঘোষিত হয়েছিল আর একটি পালিসি স্টেটমেন্ট! তাতে উৎসেই দূষণ রোধ করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাধারণ মানুষকে অংশীদার করার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল!

এই দুটি নীতি সংক্রান্ত ঘোষণার বিষয়ে আমি সম্প্রতি অবহিত হয়েছি। 1992 এর 'হিন্দু সার্ভে অফ দি এনভায়রণমেন্ট' এ এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় বা রাজ্য স্তরের সাম্প্রতিক কোন প্রকাশনায় এগুলি নজরে আসেনি বা কোন উল্লেখও পাইনি। এমনকি পরিবেশ ও বন দপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও এবিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। ই-মেল করেও কোন উত্তর পাইনি। তাই আমার মনে হয়েছিল বোধহয় এমন কোন নীতি ঘোষণা আমাদের নেই।

অবশ্য বাস্তবে এই নীতি ঘোষণা থাকা ও না থাকার কারণে যদি কিছু ঘটে থাকে তবে তা বরং আরও খারাপের দিকেই। কেন্দ্রে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের নীতিগত অবস্থানও পাল্টে গেছে --কার্যপ্রণালীর নিরিখে এটি ঠিক। কিন্তু কোনরকম পরিবর্তিত নীতির ঘোষণার কথা জানি না। □

রবীন মজুমদার

বিতর্ক : পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র

এ বছরের শুরুতে নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশন (NPC), পরমাণু শক্তি কমিশন (AEC)এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার দক্ষিণ চবিবশ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার পর থেকেই রাজ্যের সর্বত্র এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ধিক্কার ও সার্বিক বিরোধিতার ঝড় ওঠে। বহু বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংগঠনের আয়োজনে শিক্ষণ শিবির, পদযাত্রা, পথসভা, পোষ্টারিং প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে ব্যাপকভাবে। পরমাণু বিদ্যুৎ-প্রযুক্তি আদপে বোমা-বানানোর অছিলামাত্র, পরমাণু চুল্লীর ভয়ঙ্করত্ব, নিরাপত্তার অভাব, পরমাণু জ্বালানী বর্জ্যের বিপদ, মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব, প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবহিত করবার প্রয়াস চালানো হয়। এর সাথে সাথে পরমাণু বিদ্যুতের অর্থনীতির দিকটাও মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। আন্তরিক প্রয়াসে যুক্তির উপস্থাপনায় তুলে ধরা হয় পরমাণু-বিদ্যুতের প্রকৃত উৎপাদন মূল্য—যা মোটেই সস্তা নয়। একে সস্তা করে দেখানোটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, স্বার্থঘটিত! এই ধারণার লালনায় রয়েছেন বিজ্ঞানীকুল, রাজনীতিক, সরকারী আমলা, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, প্রভৃতি! এই প্রসঙ্গে টেনে আনা হয় জলবিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুশক্তি, সমুদ্র শক্তির উপযোগিতার বিষয়টি। যুক্তি দিয়ে দেখানো হয় এ জাতীয় অপ্রচলিত শক্তির প্রায় সবকটিই পরমাণু বিদ্যুতের তুলনায় অনেক বেশী নিরাপদ, সস্তা, জীব ও পরিবেশের স্থায়ী ক্ষতির সম্ভাবনা এদের ক্ষেত্রে তুলানামূলকভাবে নগন্য। এর সাথেই, তুলে ধরা হয়েছে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চালচিত্রটিকে। উন্নত দেশগুলিতে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন যে কমছে, একের পর এক পরমাণুচুল্লী বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, তার পিছনে যে রয়েছে নিরাপত্তার অভাবজনিত তীব্র হতাশাবোধ, উদ্বেল-হয়ে-ওঠা আন্দোলন, জনসমক্ষে তার বিবরণ রাখা হচ্ছে তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে। এই উপলক্ষ্যে 'গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র' পশ্চিমবঙ্গ, জানুয়ারী, 2000-এ প্রকাশ করে একটি প্রচার পুস্তিকা "কেন আমরা পরমাণু চুল্লীর বিরুদ্ধে"। এতে সমস্ত বিষয়টির চুলচেরা বিশ্লেষণ থাকে। আমজনতাকে অঙ্গীকার নিতে অনুপ্রাণিত করা হয় পরমাণু চুল্লীর বিরুদ্ধে :

* না, কোন মূল্যেই পরমাণু চুল্লী চাই না। চাই প্রতিরোধ গড়তে এই পৃথিবীকে তেজস্ক্রিয় করে তোলার সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে।

* পঃ বঙ্গে পারমাণু চুল্লী বসানোর সমস্ত উদ্যোগ অবিলম্বে বাতিল বলে সরকারকে ঘোষণা করতে হবে।

* বিকল্প সৌরবিদ্যুৎ, জোয়ার ভাঁটা থেকে শক্তি এবং বায়ু-শক্তি ইত্যাদি যাদের বিপুল সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে তাদের উৎপাদন ও গবেষণার জন্য ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে।'

একই বিষয়ের উপর এরা একটি কর্মীশিবিরেরও আয়োজন করে 18ই জুন, 2000, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুলের হলে।

20 শে মে 2000 কলকাতার জর্জভবনে 'নবান্ন পত্রিকা' ও 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব মার্কসিষ্ট স্টাডিজ' -এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় আর্থিক, সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তা ইত্যাদির প্রশ্নে পরমাণু প্রকল্পের প্রভাব নিয়ে মত বিনিময় হয়। ঐ সভায় এরকম ধারণা করা হয় যে সুন্দরবনে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার পূর্বেকার বিকল্প শক্তির অন্বেষণের নীতি থেকে সরে এসে একটি জনবিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

12 জুন, 2000 'পশ্চিমবঙ্গ ড্রাগ অ্যাকশন্ ফোরাম' ও আরও কয়েকটি গণসংগঠনের তত্ত্বাবধানে কলকাতার স্টুডেন্টস্ হলে আয়োজিত নাগরিক সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে বিশদ ভাবনা চিন্তা করা হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের মূল দাবিসনদটুকু এরকম –" এই নাগরিক সম্মেলন নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকে অবাঞ্ছিত বলে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছে এবং সর্বস্তরে মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে তারা যেন পশ্চিমবঙ্গে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসানোর মূঢ় উদ্যোগকে ব্যর্থ করার জন্য সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে বিপজ্জনক ও পরিহার্য নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানোর তুঘলকী উদ্যোগ থেকে বিরত

থাকার জন্য। সম্মেলন স্থির করেছে যে এই সিদ্ধান্তগুলি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রচার করবে এবং প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেবে।"

"ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারস্ ডিভিশনাল সাবকমিটি অব ইনস্টিটিউশান্ অব ইঞ্জিনিয়ারস্ (ইণ্ডিয়া)' এবং 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট সেন্টার অব ফসেট্ (ফেডারেশন অব সায়নটিস্ট্স্, ইঞ্জিনিয়ারস্ এ্যাণ্ড টেকনোলজিষ্টস্)'-এর উদ্যোগ 14 জুন, 2000 কলকাতার গোখেল রোডে ইন্স্টিটিউশান্ অব ইঞ্জিনিয়ারস্-এর নিজস্ব ভবনে, নিউক্লিয়ার এনার্জি ও এ্যান্ভ্যায়রণনমেন্ট শীর্ষক এক যৌথ আলোচনার (প্যানেল-ডিসকাশন) আয়োজন করা হয়। সভায় কিছু বক্তা পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে সওয়াল করে এ ধরণের বিদ্যুৎ প্রযুক্তিকে নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও সস্তা বলে অভিহিত করেন। সাংসদ শ্রী রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক এজাতীয় মতবাদের পুরোধা ছিলেন। 'এ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেশন বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডঃ আদিনারায়ণ গোপালকৃষ্ণণ পরমাণুকেন্দ্রের নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এধরণের প্রযুক্তির ভয়াবহতার দিকটি তুলে ধরেন। 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডঃ দেবকুমার বসু হিসাবশাস্ত্রের প্রচলিত পদ্ধতির নিরিখে বিচার করে সিদ্ধান্তে আসেন যে পরমাণু বিদ্যুৎ মোটেই সস্তা নয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব এনার্জি স্টাডিজের প্রধান অধ্যাপক সুজয় বসু পরমাণু বিদ্যুৎ প্রযুক্তির বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেওয়ার সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি রাজ্যের ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আনা সুপ্রীম কোর্টের এক মামলার উল্লেখ করেন। ঐ মামলায় সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে পারমাণবিক বর্জ্য পদার্থ মাটিতে পোঁতার ব্যাপারে রাজ্যগুলির তরফে তীব্র আপত্তি জানানো হয়।

30শে জুন, 2000 কলকাতার স্টুডেন্টস্ হলে 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি' এবং 'গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র' যৌথ উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

7ই জুলাই 2000 'কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার' শিয়ালদা রাণাঘাট রুটে চলমান ট্রেনে পরমাণু চুল্লীর বিরুদ্ধে এক প্রচারাভিযানে নামে। পরমাণু চুল্লী বসানোর সরকারী চেষ্টা যে কত মারাত্মক, তা সাধারণের কাছে তুলে ধরতে সাথে ছিল প্রচার পুস্তিকা, পোষ্টার, গাওয়া হচ্ছিল গান।

'পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাড়ছে সচেতন প্রতিবাদ —তারা বলছে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র কেবল বিদ্যুৎই দেয় না, তার সাথে যোগান দেয় ক্রম বর্দ্ধমান হারে এক বিকলাঙ্গ, মৃতপ্রায় মানবসম্পদ(!) ও প্রাকৃতিক সম্পদ (!)।' এই বাস্তব অভিধার দিক থেকে বিচার করে 'পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে' যে বিপুল আয়োজন ও উদ্যোগ গ্রহণ চলছে তার বিরোধিতায় 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পূর্বকলকাতা শাখা' 8ই জুলাই, 2000 বেলেঘাটা -ফুলবাগান সংলগ্ন সুকান্ত মঞ্চে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এখানে পারমাণবিক বিদ্যুতের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন বিহারের যদুগোড়া ইউরেনিয়াম প্রকল্পের একজন প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার। পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভয়ঙ্করত্ব, তার নিরাপত্তার অভাবজনিত অসুবিধা এবং তার কারণে জড় ও জীবের উপর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তথ্যভিত্তিক অনুপুঙ্খ আলোচনা করেন শ্রী প্রদীপ দত্ত। শ্রীমতী জয়া মিত্রের পরমাণু-বিদ্যুৎ বিরোধী বক্তব্যও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

ক্যানিং-এর 'যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা' 7ই জুলাই, 2000 ক্যানিং শিশু নালান্দা স্কুলে 'সুন্দরবনে অমানবিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে' শীর্ষক একটি কনভেনশনের আয়োজন করে। এঁদের প্রচারপত্রের কয়েকটি পংক্তি মনে রাখার মত 'ত্রিশ লক্ষ মানুষ বসবাসকারী সুন্দরবন—অসামান্য জীবজগতের বাদাবন সুন্দরবন—ঐতিহাসিক গল্প-গাথার দক্ষিণ চবিব্শপরগণা-- ইতিহাস সৃষ্টিকারী পশ্চিমবঙ্গ, সবাই তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হবে। জল-বায়ু, গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখী, মানুষ—নিস্তার নেই কারও'। এঁদের আয়োজনে প্রতিবাদে সামিল হন অজস্র মানুষ যাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তনমন্ত্রী, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, উকিল, নাট্যকার, কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, প্রাক্তন সাংসদ, পরিবেশবিদ্, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, এবং অগণিত মানুষ। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন ছোটবড় ক্লাব, স্বর্ণশিল্পীসমিতি, গ্রামপঞ্চায়েত, বিদ্যুৎ-গ্রাহক সঙঘ, চাউল ব্যবসায়ী সমিতি, বাজার ব্যবসায়ী সমিতি এবং অসংখ্য যুক্তিবাদী ও গণবিজ্ঞান সংগঠন।

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা 'পরমাণু বিদ্যুৎ চাই না' নামে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা এক খোলা চিঠিতে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রযুক্তি যে প্রচণ্ড 'বিপদ সংকুল', 'দুর্ঘটনাপ্রবণ', 'পরমাণু বিদ্যুৎ মোটেই শস্তা নয়', এজাতীয় প্রকল্পের 'তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সংরক্ষণের প্রচণ্ড সমস্যা রয়েছে' এটা যে কার্যত 'বোমা বানানোর ফিকির', নিশ্চিতভাবে 'পরিবেশের

ভারসাম্য নষ্ট করে' প্রভৃতি দিকগুলির উল্লেখ করে জানতে চান যে, 'কার স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার এমন সর্বনাশা পদক্ষেপ নিতে চলেছেন। পরমাণু শক্তির ভক্তদের সকল দাবিকে যুক্তি সহকারে নস্যাৎ করে তাঁরা বলেন যে 'বিকল্প আছে অনেক'। পরমাণু প্রকল্পে নিয়োজিত অর্থ সংক্রান্ত সকল সংবাদ, ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ চেহারা জনগণের কাছে গোপন রাখা হয় এ অভিযোগ তুলে তাঁরা দাবি করেন যে সমস্ত 'লুকোছাপা বন্ধ হোক'। এই সূত্রে তাঁদের দাবিগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

* পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে।

* সমস্ত পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করার সময়সীমা নির্দিষ্টকরণের প্রক্রিয়া চালাতে হবে।

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরমাণু শক্তিসংক্রান্ত গবেষণার বরাদ্দ বন্ধ করে পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

*পরমাণু শক্তিসংক্রান্ত যাবতীয় অর্থনৈতিক হিসাব ও অন্যান্য ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

পরিশেষে তাঁরা দৃঢ় অঙ্গীকার করেন যে তারা 'পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত কোন গবেষণার কাজে যুক্ত থাকবেন না'।

সারা পশ্চিম বাংলা জুড়েই সরকারী উদ্যোগে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সমাবেশ সংগঠিত হচ্ছে। তার সব খবর আমরা নিশ্চয়ই রাখতে পারছি না। তবুও, বিস্তারিতভাবে না হলেও এ ধরণের আয়োজনের সংক্ষিপ্ত সমাচার নীচের লাইগুলিতে দেওয়ার করার চেষ্টা করছি ঃ

* 6 ই মে, 7 ক্যানিং-এ গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের উদ্যোগে পরমাণুবিদ্যুৎ বিরোধী মিছিল ও পথসভা।

* 13 ই মে, 2000 কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে 'চেতনা' আয়োজিত পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বিরোধী আলোচনাসভা।

* 21শে মে, 2000 দমদম প্রাচ্যবাণী বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের অপ্রয়োজনীয়তা ও ভয়াবহতা নিয়ে এক আলোচনা সভা হয়।

* সদ্যগঠিত স্থানীয় 'পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বিরোধী মঞ্চের' আয়োজনে 27 শে মে, 2000 মথুরাপুরের কাদিপুকুর গ্রামে পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধী সভা।

* 4ঠা জুন, 2000 জয়নগরে এলাকার নাগরিক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধী কনভেনশন।

* 4 ঠা জুন, 2000 কলকাতার বাংলা একাডেমিতে 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চে'র আয়োজনে আলোচনা সভা।

* 10ই জুন, 2000 'আবাদ ও আবাস বাঁচাও সমিতির উদ্যোগে কুলপীতে প্রতিবাদ সভা।

* 11ই জুন, 2000 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির বনগাঁ শাখার তত্ত্বাবধানে আলোচনা সভা।

* 18ই জুন, 2000 'ডায়মণ্ডহারবার দূষণ প্রতিরোধ সমিতি'র উদ্যোগে সাইকেল মিছিল।

* 12ই জুলাই, 2000 'দুর্গাপুর দ্বারকা নাথ কোটনিস্ স্মৃতিরক্ষা কমিটি', পিপ্‌ল্‌স্ ফোরাম, দুর্গাপুর' এবং 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি'র দুর্গাপুর শাখার যৌথ উদ্যোগে দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীতে আলোচনা সভা।

* 17 জুলাই, 2000, 'প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাত্র সংসদ' (পি.সি.এস.এ.)-এর আয়োজনে ঐ কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের সভা কক্ষে আলোচনাসভা।

* 18-19 শে জুলাই, 2000 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে মালদা কলেজ প্রাঙ্গনে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা সভা ও স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা।

* 30শে জুলাই, 2000 'আড়িয়াদহ অ্যাসোশিয়েশনের' 'লাইব্রেরী এ্যাণ্ড লিটারারী ক্লাব' ঘরে, আড়িয়াদহ দক্ষিণেশ্বরের 'আগামী শতাব্দী'র উদ্যোগে পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধী সভা।

সময়ে সময়ে এসব প্রতিবাদী সভাসমাবেশের খবর দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতেও প্রকাশি হয়েছে। যুক্তিবাদী সংস্থা ও গণ বিজ্ঞান সংগঠনগুলি তাদের নিজস্ব মুখপত্রের মাধ্যমেও যতটা পেরেছে প্রচার করেছে। এ প্রসংগে সম্প্রতি একটি সাময়িক পত্রিকায় শ্রী জিতেন নন্দীর 'সুন্দরবনে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ঃ দাবি এবং প্রতিবাদ' শীর্ষক প্রতিবেদনটি বিশেষে উল্লেখের দাবি রাখে। পরমাণু বিদ্যুতের বিরোধিতায় সভা সমাবেশের অনুপুঙ্খ বিবরণ এই প্রতিবেদনটিতে ধরা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনার সরকারী উদ্যোগের সূত্র ধরে সম্প্রতি দৈনিক ও সাময়িক পত্র পত্রিকায় যেসব নিবন্ধ ও সাধারণ পাঠকের মতামত ছাপা হয়েছে তার আলোচনাও এক্ষেত্রে দরকারী বলে মনে হয়। 'নন্দলাল' শিরোনামে প্রকাশিত পত্রে(আঃ বাঃ পত্রিকা, 17 জুন) শ্রী নারায়ণ ভট্টাচার্য পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পক্ষে যুক্তি দেখান। আসলে তাঁর পত্রলেখা মূলতঃ শ্রী অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজ্যে পারমাণবিক বিপদ, আপনার আমার বিপদ' নামের লেখার বিরোধিতা করেই (আঃ বাঃ পত্রিকা, 15 মে)।

শ্রীমতী শর্মিলা বসু লেখেন 'পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ! উন্নত দুনিয়া কিন্তু পিছিয়ে গেছে' শীর্ষক নিবন্ধ (আঃ বাঃ পত্রিকা, 20 জুন)। পরমাণু প্রযুক্তি ভাবনাকে কেন্দ্র করে পাঠকমন বেশ আন্দোলিত হয়েছে তা বোঝা যায়। 'নৈহাটি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এ্যাণ্ড কালচার, গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, নৈহাটি'র শ্রী রাণা মণ্ডল, কলকাতা 91 এর শ্রী কমলা প্রসাদ ঘোষ, 'অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুজিত বিশ্বাস, নারায়ণ বাবুর বক্তব্যের বিরোধিতা করেন (আঃ বাঃ পত্রিকা, 4 জুলাই)। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে 1986 সালে চেরনোবিল পরমাণুকেন্দ্রে ঘটা দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতির উল্লেখ প্রসংগে রাণাবাবু বলেন,'চেরনোবিল দুর্ঘটনায় তাৎক্ষণিক মৃত্যু নেই বললেই চলে। দুর্ঘটনায় এখনও অবধি আক্রান্তের সংখ্যা 70 লক্ষ মানুষ। এর মধ্যে শুধু বেলারুস-এরই আছে 46 লক্ষ লোক (ইউ এন ও রিপোর্ট অনুযায়ী)। দুর্ঘটনার পর শুধু উদ্ধার কাজেই লেগেছিল 6 লক্ষ লোক। যার মধ্যে বিপুল তেজস্ক্রিয়তার দরুণ অচিরেই মারা গেছেন 10,000 লোক এবং এখনও অবধি মোট মৃত্যুর সংখ্যা 30,000 যার মধ্যে 3000 মানুষ মারা গেছেন আত্মহত্যা করে।' কমলাপ্রসাদ বাবু ভারতে অপ্রচলিত শক্তিসম্ভারের পর্যাপ্ত বিবরণ দিয়ে (যেমন, বায়ুশক্তি থেকে 20,000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, সৌরশক্তিদিয়ে বার্ষিক 5×10^5Kwh পরিমাণ কাজ, সমুদ্র জলের তাপবৈষম্য, জোয়ার ভাটা ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের বিপুল সম্ভাবনা ইত্যাদি) সিদ্ধান্ত করেন যে এদেশের পরমাণু বিদ্যুতের দিকে ঝোঁকার কোন প্রয়োজন নেই। সুজিত বাবুর সিদ্ধান্তও এ প্রসংগে প্রনিধানযোগ্য-- "অন্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদের বাতাবরণ সৃষ্টি করে দুনিয়াব্যাপী পরমাণু শক্তি অর্জনের যে লড়াই এবং দুনিয়াকে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার যে প্রচেষ্টা চলেছে তার সাথে দেশের অগ্রগতির কোন সম্পর্ক নেই। তা আগামী দিনের ধ্বংসের ইংগিত বহন করে।" বাঁকুড়ার শ্রী ইন্দ্রনীল মুখ্যোপাধায় শ্রীমতী বসুর লেখার প্রসংগ টেনে বলেন, 'পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পিছনের মূল ভূমিকা কেন্দ্রীয় সরকারের। ..... আমাদের রাজ্য কোন দায়দায়িত্ব নেবে না, আবার অন্য কোথাও স্থাপিত পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ কিনতেও তখন আপত্তি থাকবে না নিশ্চয়ই। এ তো চরম সুবিধাবাদী মনোভাব। এমন গা-বাঁচোয়া নীতি সবাই মানলে দেশের উন্নতি হবে কি?' (আঃ বাঃ পত্রিকা, 8 জুলাই)।

শ্রী রূপকুমার বসু তাঁর "পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ ঃ রাজনীতিক ও বিজ্ঞানীরা আর একটু ঝেড়ে কাশুন" শীর্ষক নিবন্ধে (বর্তমান, 27 জুন)পরমাণু বিদ্যুতের অর্থনীতির প্রকৃতরূপটিকে খুঁজে দেখতে চান। পরমাণুবিদ্যুতের প্রবক্তারা তাকে যে সস্তা ও রক্ষণাবেক্ষণে কম খরচসাপেক্ষ বলে দাবি করে থাকেন, তার যথার্থতাও তিনি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেন। একই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম একটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও একটি তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ার খরচ, ঐ পরমাণু চুল্লী ও তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের গড় আয়ু, পরমাণু চুল্লী অচল বা বাতিল হলে তা ধ্বংসের উপায় ও তার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ, পরমাণু জ্বালানীর বর্জ্যসংরক্ষণের খরচ ও পারমাণবিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই ডাম্পিংয়ের খরচ, প্রায় অনন্ত কাল ধরে পারমাণবিক বর্জ্যকে ঠাণ্ডা রাখতে জলসরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রাথমিক খরচ, রেকারিং খরচ, বছর বছর নতুন নতুন বর্জ্যের জন্য নতুন করে বিনিয়োগ সংক্রান্ত খরচ প্রভৃতির প্রশ্ন তুলে তিনি বিজ্ঞানী ও রাজনীতিকদের কাছে এক মেগাওয়াট পরিমাণ পরমাণু বিদ্যুতের দাম জানতে চান।

পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে জনমত যে ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে তা কার্যত স্বীকার করে নিলেন, এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্যোক্তা মথুরাপুর সংসদীয় ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি শ্রী রাধিকারঞ্জন প্রামানিক--তাঁর 'Chernobyl best forgotten" শিরোনামের লেখায় (Statesman, 15 জুলাই)। সুন্দরবন অঞ্চলে এই উদ্যোগের সূচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েই তিনি বলেন "After the news was flashed, an uncalled for antinuclear campaign was launched in West Bengal. The protesters' statements were unscientific, laced with stories of imaginary accidents and topped off with personal attacks". বিস্তর তথ্য চালাচালির পর শ্রী প্রামাণিক বলেন, 'No one has died from radiation from any nuclear power station in the world till now." জনপ্রতিনিধি জনপ্রতিবাদের জন্যই বোধহয় জনগণের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন,"It would be detrimental to the progress of the nation and West Bengal if we are to be swayed by false propaganda." এপ্রসঙ্গে বোধহয় উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে উক্ত সাংসদের সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত বিধানসভাগুলির কয়েকজন সদস্যের রাজনৈতিক অবস্থান একই

জোটে হলেও, এ ব্যাপারে তাঁদের দলগত অবস্থান মাননীয় সাংসদের থেকে ভিন্ন। তাঁরা প্রত্যেকেই সুন্দরবনে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা করেছেন (আঃ বাঃ, 27 জুলাই)। পরমাণু বিদ্যুৎ যে মোটেই সস্তা নয়, মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা এ ধরণের প্রকল্পে যে অত্যন্ত বেশী, 'চেরনোবিল বা থ্রিমাইল আইল্যাণ্ডে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলি ব্যতিক্রম, নিয়মের নজির নয়'— এ জাতীয় প্রচার যে সর্বৈ মিথ্যা এ বিষয়ে প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন শ্রী মৃন্ময় চন্দ তার "Why split atom over an N-Plant?" শিরোনামের লেখায় (Statesman, 15 জুলাই)। রামনগর থেকে শ্রী আর. এন বিশ্বাস এবং খড়গপুর থেকে শ্রী ডি. এন-বোস রাধিকাবাবুর নিবন্ধটিতে প্রকাশিত বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে খবরের কাগজে চিঠি লেখেন (Statesman, 1 আগষ্ট)। শ্রী বিশ্বাসের কথায় " At the present moment it is better not to go ahead with such risky projects till such a date a new technology comes up to cope up with the depletion of fossil fuels." এবং শ্রী বোসের ভাষায় "Will the DAE and NPC disclose to the public its plans for waste disposal for the next 50 years before it launches its ambitious power generation projects?" --অংশগুলি বোধ হয় পরমাণু বিদ্যুৎ প্রযুক্তির বিরুদ্ধে সাধারণের বিরোধিতাই তীব্রভাবে উপস্থাপিত করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক শ্রী মানস জোয়ারদার তার 'N-Power risks won't go away" নামের নিবন্ধে সার্বিক পরিস্থিতির বিচার করে বলেন যে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রযুক্তির নিরাপত্তা, পরিবেশের উপর তার প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ের তুলমূল্য বিশ্লেষণ না করেই শুধু তার গায়ে 'সুলভ' এই তক্‌মা লাগানো সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক (Statesman, 22 জুলাই)। বিপরীতক্রমে, এ ধরণের প্রচেষ্টা সারা পৃথিবীর উপরই নিষ্করুণ শাসানি প্রদর্শনের নামান্তর। শ্রী সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরমাণু বিদ্যুৎ সস্তা তো নয়ই, পরিণতিও মারাত্মক' শীর্ষক নিবন্ধটিও এপ্রসংগে উল্লেখনীয়। এই নিবন্ধে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরমাণু বিদ্যুতের সুলভত্বের দাবিটিকে নস্যাৎ করেছেন। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে পারমাণবিক জ্বালানীর অবশেষ বা বর্জ্য পরিবহনকারী ট্রাকগুলি কতটা ভয়াবহ পরিমান তেজস্ক্রিয়তা বয়ে বেড়ায় জনপদের মধ্যদিয়ে এবং কি সাংঘাতিক হতে পারে এই ট্রাকগুলির সামান্যতম দুর্ঘটনাও (বর্তমান, 1 আগষ্ট)!

সরকারী উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রতিবাদে সাময়িক পত্রিকাগুলিও সমানভাবে মুখর। সম্প্রতি একটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। অপর একটি সাময়িক পত্রের সম্পাদকীয়তে (উৎস মানুষ, মে-জুন) লেখা "..... সুন্দরবন অঞ্চলের বেশ কিছু গ্রামে, ঘরের দেওয়ালে, দোকানের দরমায় পোষ্টার পড়েছে বামফ্রন্টের নামে— 'সুন্দরবনে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বসাতে হবে।' রীতিমত জোরদার দাবি। মনে হচ্ছিল, এ যেন বিদ্যুৎ এনে দেওয়ার নামে জল-জঙ্গল আর অনাবিল প্রকৃতি জগৎ জুড়ে বিস্তীর্ণ শ্মশানভূমি (তেজস্ক্রিয়) রচনার প্রস্তুতি ঘোষণা। কেবল একটু অন্য ভাষায় এই যা"। সাময়িকীটির "পরমাণু বিদ্যুৎ বাঞ্ছিত নয়" শীর্ষক নিবন্ধে শ্রী প্রদীপ দত্ত তথ্য সহকারে বিচার করে সিদ্ধান্তে আসতে চান যে 'পরমাণু বিদ্যুৎ' হল 'আত্মঘাতী ভগ্নদূত'। সদ্য-প্রকাশিত একটি সাময়িক পত্রে শ্রী গৌতম রায়ের "৫ই জুন, ২০০০" শীর্ষক লেখাটি বেশ উপভোগ্য (ঈহা, এপ্রিল-জুন 2000)। শ্রী রায় তাঁর লেখায় ভবিষ্যৎ দর্শন করেছেন। তখন, অর্থাৎ, 2020তে সুন্দরবনের মথুরাপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রটি চালু হয়ে গেছে এবং নিউক্লিয়ার-বিরোধীদের আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করে তাতে দেখা দিয়েছে ; গোলযোগ—তা থেকে কালক্রমে ঘটেছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। তেজস্ক্রিয় বিষবাষ্প ছড়িয়ে যাচ্ছে গোটা সুন্দরবনে। ভয়ঙ্কর পরিণতি। সুন্দরবনের মথুরাপুর ও তার সন্নিহিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে যাওয়া তেজস্ক্রিয়তায় ক্ষয়ক্ষতি অনুমানের যে চেষ্টা শ্রী রায় করেছেন, তাতে শিউরে ওঠে গা। শ্রী নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরমাণু প্রযুক্তির পক্ষে সওয়াল করে যতই ব্যঙ্গস্বরে দ্বিজেন রায়ের কবিতা আওড়ান ঃ 'নৌকা ফিসন, ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়

হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ী চাপা পড়া ভয়।'----

গৌতমবাবুর কল্পনার তীক্ষ্ণ খোঁচায় মনে হয় 'নন্দলাল' হওয়াই বুঝি ভাল ছিল। সরকার জনমতের মূল্য দেয় কিনা এখন সেটাই দেখার। □

রি পো র্ট

□

পেনসন পেলেন প্রিয়ব্রত সেনগুপ্ত

ঘোলা নতুন রাস্তা বাসস্টপ সংলগ্ন 27 নম্বর অমরাপুরীর বাসিন্দা শ্রী প্রিয়ব্রত সেনগুপ্তকে আর ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে সাত সকালে বেড়িয়ে পড়তে হচ্ছে না। 1997 সালে ঘোলা নয়া পাঠশালা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়া প্রিয়ব্রতবাবুর কাছে এটাই ছিল বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন। দুর্দশার শুরু 1992 থেকে যেদিন তাঁর ষাট বছর পূর্ণ হয়। তারপর 1997 পর্যন্ত আরো পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেও মাইনে পেয়েছেন মাত্র পনের মাসের। গত ডিসেম্বর মাসে স্টেটসম্যান কাগজে সোদপুর স্টেশনে ভিক্ষারত প্রিয়ব্রতবাবুর দুর্ভাগ্যের সচিত্র ইতিহাস প্রকাশ, অনেক মানুষের সাহায্য-সহানুভূতি, মামলা মোকদ্দমা—সব মিলিয়ে ভালো রকমের সাড়াই বলতে হবে। তারই হাত ধরে শেষ পর্যন্ত প্রিয়ব্রতবাবুর স্বাভাবিক মানুষের জীবন ফিরে পাওয়া।

কাগজে রিপোর্ট বেরোনর পর দিনই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জনস্বার্থবাহী মামলা দায়ের করেছিলেন শ্রীপ্রলয় হীরা। রিট পিটিসন নম্বর 2729/1999। স্বেচ্ছায় পুরো মামলাটি পরিচালনা করেছেন অ্যাডভোকেট শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। পারিশ্রমিকের প্রশ্ন নেই। আনুষঙ্গিক খরচপত্রও চালিয়েছেন নিজেই। দীর্ঘদিন মামলার শুনানি চলেছে। সব মিলিয়ে দিন বারো। সুব্রতবাবু তুলে ধরেছেন সরকারি বঞ্চনার, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ধারাবাহিক কাহিনী। 24 এ মার্চ প্রধান বিচারপতি অশোক কুমার মাথুর এবং বিচারপতি আলতামাস কবীরের রায় : 'Learned Advocate for the State respondents states that the process of release of pension/retiral benefit to Sri Priyabrata Sengupta, ex-teacher of Naya Pathsala Prathamik Vidyalaya, Sodepur, 24 Parganas (North), has already been started.

Learned Advocate should inform the Court within 4 weeks whether the pension has been released to the incumbent.'

কোর্টের অনুরূপ নির্দেশ আগেও লঙিঘত হয়েছে। এবারও ব্যতিক্রম নয়। সুব্রতবাবু প্রতিবারই বিচারপতিদের নজরে এসব এনেছেন। 27 এ জুন ডিভিশন বেঞ্চের এজলাস বসে। শেষ পর্যন্ত ঐ মাসেই পেনসনের বকেয়া বাবদ লাখ দেড়েক টাকা প্রিয়ব্রতবাবুর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। আগেই আদালতের নির্দেশেই প্রভিডেন্ট ফান্ডের হাজার বারো টাকা হাতে এসেছিল। আশা করা যাক—এর পর প্রিয়ব্রতবাবু মাসিক পেনসনের টাকা ঠিক ঠিক পেয়ে যাবেন। একটাই দুঃখ তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না—ষাট থেকে পঁয়ষট্টি, এই পাঁচ বছর শিক্ষকতার জন্য তাঁকে কোন বেতনই দেওয়া হয় নি। যা দেওয়া হয়েছিল তাও কেটে নেওয়া হয়েছে। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের অধ্যাবসায় জয়ী হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন—ভবিষ্যতেও তাঁর সহানুভূতির অভাব হবে না। অবসরের পর পাওনা গণ্ডা নিয়ে হতাশ শিক্ষকরা প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন।

মানস জোয়ারদার

□□

"দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা" বিষয়ে জন শুনানী

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়নের পরে চার দশকেরও বেশী অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে বছরে বছরে নিম্নদামোদর অঞ্চলে বন্যা বেড়েছে। নদীর ভাঙন বেড়েছে—আবার অন্য দিকে দামোদরের উজান অংশে বোরো চাষ বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। বর্দ্ধমান জেলার সদর রাস্তার ধারে গড়ে উঠেছে সারি সারি চালের আড়ত।

সম্প্রতি, এপ্রিল 27, 2000, ন্যাশানাল এ্যালায়েন্স অব পিপলস মুভমেন্ট, দামোদর বাঁচাও আন্দোলন এবং হাওড়ার রসপুরের অগ্রগতি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে "দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা সাফল্য ও ব্যর্থতা" এই শিরোনামে একটি জনশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে সম্ভবত এই প্রথম একটি "উন্নয়ন" প্রকল্প নিয়ে বেসরকারী উদ্যোগে একটি জনশুনানী অনুষ্ঠিত হলো।

এই শুনানী পরিচালনার জন্য যে বিচারক মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অরবিন্দনাথ বসু, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান ডঃ অরবিন্দ বিশ্বাস, ড্রাগ অ্যকশন ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ-র সভাপতি ডাঃ সুজিত দাস, স্থানীয় বিধায়ক শ্রী প্রত্যুষ মুখ্যোপাধ্যায় এবং রসপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী নিমাই মান্না। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নর্মাদা বাঁচাও আন্দোলনের পক্ষ থেকে শ্রীমতি

মেধা পাটকার, তিনি আবার ওয়ার্ল্ড কমিশন অফ ড্যাম-এরও একজন সদস্যা।

অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র, গণ আন্দোলনের রাষ্ট্রীয় সমন্বয়ের পক্ষ থেকে দামোদর উপত্যকা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সহযোগে এই পরিকল্পনার সুবিধে-অসুবিধের দিকগুলো তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে রণ্ডিয়াতে যদিও সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ 800,000 কিউসেক কিন্তু রণ্ডিয়া সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জল প্রবাহ ধারণ করতে পারে তা হলো 250,000 কিউসেক। ফলে বন্যা প্রায় অবধারিত। এছাড়া হুগলী নদীতে জোয়ার ভাঁটার তারতম্য প্রচুর, ফলে নদীর সমুদ্র অভিমুখী প্রবাহ বাধা পায়। মোট ফল হলো হুগলী এবং হাওড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়।

এই শুনানীতে বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া এবং পুরুলিয়া জেলা থেকে দামোদর উপত্যকার পরিকল্পনার ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠি তাঁদের বক্তব্য রাখেন- সব মিলিয়ে প্রায় কুড়ি জন। দামোদর পরিকল্পনার পক্ষ থেকে কেউ উপস্থিত ছিলেন না, তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার সরকারী বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, যদি নিম্নদামোদর 250,000 কিউসেক জল প্রবাহ ধারণ করতে না পারে তবে বন্যা রোধের কোনও সম্ভাবনাই নেই।

আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই একমত যে মুণ্ডেশ্বরী দিয়ে জল প্রবাহ বাড়ানো দরকার, খনন প্রয়োজন, ডিভিসি'র জলাধার থেকে জল ছাড়ার একটি ছন্দ প্রয়োজন এবং বোরো চাষের জন্য জল ধরে রাখা বন্যার অন্যতম প্রধান কারণ।

মেধা পাটকার তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা বৃটিশ রাজ হঠানর সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ আদর্শে সমাজ গড়ারও বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু 47-এর পরে কি ঘটলো? আমরা একের পর এক পশ্চিমী ধাঁচের 'উন্নয়ন' পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম।

শুনানীর শেষে যে সব বক্তব্য বেরিয়ে আসে তার নির্যাস হলো:

* নিকাশী ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে
* হুগলীতে ডাকাতিয়া খাল সম্পূর্ণ করতে হবে
* নদীর পাড়ে মাটির বাঁধ দেওয়া বন্ধ করতে হবে
* নিম্নদামোদরে বেশী জল আনার বন্দোবস্ত করতে হবে
* হুগলী, মুণ্ডেশ্বরী এবং রূপনারায়ণ নদীকে নিয়মিত পলিমুক্ত করতে হবে

পরবর্তী সময়ে (জুন 10-11, 2000) একটি নমুনা সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষা থেকে বেরিয়ে আসে যে দামোদর পরিকল্পনা সেচের জন্য তার যে ঘোষিত লক্ষ্য তার কাছাকাছিও পৌঁছুতে পারেনি অথচ চাষিদের জলে টান পড়েছে। ফলে চাষিরা তাদের চাষ বাঁচাতে পরিকল্পনাহীনভাবে জল সম্পদ ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। সমগ্র অঞ্চলের জলসম্পদ ব্যবহারের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা যদি এখনি না করা যায় তবে ভবিষ্যতে জলের হাহাকার দেখা দেবে।

শুভাশিস মুখার্জি

□□□

মৌড়ীগ্রামে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানার পরিবেশ দূষণ : একটি রিপোর্ট

মৌড়ীগ্রাম স্টেশনের বুক চিরে হাওড়া-মুম্বাই রেলপথ (দঃপূঃরেলওয়ে) উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। কিছুদিন আগেও মৌড়ীগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলের চারপাশে সবুজের প্রাচুর্য ছিল। হাওড়া থেকে, বলতে গেলে, ধিক্ ধিক্ করে থামতে থামতে আসা লোকাল ট্রেনগুলি সাঁত্রাগাছি পেরিয়ে যখন মৌড়ীগ্রামের দিকে আওয়ান হত, তখন গতি যেত অনেক বেড়ে; গায়ে এসে লাগত ঠাণ্ডা হওয়ার স্পর্শ। ঘরে ফেরা লোকেদের মৌড়ীগ্রাম এমনিভাবে রোজই সান্ধ্য-অভ্যর্থনা জানাত, ভুলিয়ে দিত শহরের কষ্ট ক্লান্ত দৈনিক অভিজ্ঞতার কথা। প্রকৃত অর্থেই মৌড়ীগ্রাম যেন ছিল পল্লীবাংলায় প্রবেশের অন্যতম দ্বারপথ!

এই মৌড়ীগ্রাম স্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, অর্থাৎ, হাওড়া থেকে পূর্বদিকে আলমপুর-মুখী আন্দুল রোডের বাঁদিকে, যা কিছুদিন আগেও ছিল সবুজ অগভীর জলাভূমি, সেখানেই গড়ে উঠেছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের একশো কোটি টাকার কারখানা-- ফ্রেজারিও কনজারভা আল্লানা লিমিটেড। মালিকানা বেসরকারী ও মুম্বাইভিত্তিক। প্রথমে কথা ছিল ফল, মাছ ও মাংসের প্রক্রিয়াকরণ হবে। অবশ্য স্থানীয় মানুষের বক্তব্য এটা নাকি কসাইখানা হচ্ছে। এ বছরের মার্চ মাস থেকে উৎপাদন শুরু হয়। প্রথম প্রথম তেমন ভাবে বোঝা না গেলেও, বিগত মে-মাস থেকে মৌড়ীগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় কারখানার চিমনি থেকে নির্গত ভয়াবহ দুর্গন্ধ যুক্ত গ্যাসে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। নিমতলা, পাঁচপাড়া, ঊনশানী, গোয়ালবাটী দুইল্যা, রবীন্দ্রনগর, উদয়ন, পুঁইল্যা, পূর্বাশা, নবনগর আন্দুল, মৌড়ী প্রভৃতি অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ প্রচণ্ড গন্ধে খাওয়া দাওয়া করতে পারছেন না, কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, বাচ্চারা স্কুলে আসতে পারছে না, বাজার, দোকানপাট, ব্যবসা

চালানো দায় হয়ে উঠেছে। পচা নাড়ি-ভূঁড়ির অবর্ণনীয় দুর্গন্ধ অথবা হাড় মজ্জা পোড়ানোর উৎকট গন্ধ এই জনবহুল এলাকাকে বিষময় করে তুলছে। খবরে প্রকাশ মাংস প্রক্রিয়াকরণ করার পর গরু, মহিষ ইত্যাদি পশুর দেহের হাড় ও অন্যান্য অবশেষ থেকে মুরগীর খাদ্য তৈরী করা হয় এই কারখানায়। এজন্য হাড় ও অন্যান্য দেহাবশেষ পোড়াতে হয়। আর তারই পরিণতিতে অবর্ণনীয় দুর্গন্ধ সারা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিবাদ স্বরূপ এলাকার মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করেছেন। গঠিত হয়েছে 'মৌড়ীগ্রাম পরিবেশ সুরক্ষা কমিটি'। তাঁরা ডাক দিয়েছেন এলাকায় সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে সামিল হওয়ার, এই উৎকট পরিবেশ-দূষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার। শুধু পচা নাড়ি-ভুঁড়ি বা হাড়ের মজ্জা পোড়ার দুর্গন্ধে সমগ্র পরিবেশকে কলুষিত করাই নয়, বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদের উল্লেখ করে 'মৌড়ীগ্রাম পরিবেশ সুরক্ষা কমিটি' জানাচ্ছে যে কারখানাটিতে বিনা অনুমতিতে বিপুল পরিমাণ তরল অ্যামোনিয়া, ডিজেল ও অন্যান্য দাহ্য বস্তু যথাযথ সুরক্ষাব্যবস্থা ছাড়াই সংরক্ষিত রয়েছে। কমিটির আরও অভিযোগ যে কারখানাটিতে বেশকিছু অবৈধভাবে খনন করা নলকূপ রয়েছে, যা থেকে দৈনিক প্রায় দশলক্ষ গ্যালন জল তোলা হচ্ছে। তাঁদের মতে এই পরিমান জল এলাকার মানুষ এক মাসে ব্যবহার করেন। কারখানাটি যদি এইভাবে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করে, তবে অদূর ভবিষ্যতে এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ তীব্র পানীয় জলের অভাবের মুখোমুখী হবেন। পরিবেশরক্ষার এই আন্দোলনে একে এক সবাই এসে জড়ো হচ্ছেন। অ-রাজনৈতিক সংগঠন,রাজনীতিক, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি থেকে শুরু করে অগণিত সাধারণ মানুষ। খবরে আরও প্রকাশ যে স্থানীয় মানুষের চাপে পড়ে হাওড়ার জেলাশাসক 18 ই জুলাই, 2000 এক সর্বদলীয় বৈঠক ডাকতে বাধ্য হন;সেখানে কারখানার প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকে স্থির হয় যে দুর্গন্ধ বন্ধ করার ব্যবস্থা না নিয়ে কারখানাটিকে চালু করা যাবে না। কারখানা কর্তৃপক্ষ এ বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছেন বলে প্রকাশ। আপাততঃ তাই উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। এর আগে স্থানীয় বিধায়কদের দ্বারা বিষয়টি বিধানসভায় উঠলে পরিবেশ মন্ত্রী জানান যে কারখানাটি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়েই উৎপাদন চালু করেছিল। অন্যদিকে সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রীর মতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র নিয়েই উৎপাদন শুরু হয়েছে। কোন বক্তব্য যে ঠিক তা মন্ত্রীরাই ভাল বলতে পারেন। পরিবেশ বাঁচানোর দাবিতে তাঁরা গত 20শে জুলাই, 2000 মৌড়ীগ্রামে রেল অবরোধের ডাক দিয়েছিলেন।

সূত্র ঃ

1. মৌড়ীগ্রাম পরিবেশ সুরক্ষা কমিটি, মৌড়ীগ্রাম, হাওড়া, কর্তৃক প্রচারিত 15 জুলাই, 2000 তারিখের আবেদনপত্র
2. আনন্দবাজার পত্রিকা, 20.07.2000

□□□□

শ্রম উদ্যোগ : একটি প্রয়াস

নাগরিক মঞ্চ - কলকাতার এটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। শিল্প, শ্রমিক, বন্ধ কলকারখানা, পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে বিগত এক দশকেরও বেশী যাবৎ কাজ করছেন পশ্চিমবঙ্গে এবং সচেতন মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষমও হয়েছেন। তাঁদেরই আর এক অভিনব প্রয়াস—শ্রম উদ্যোগ।

কি উদ্দেশ্য ? ওঁদের কথাতেই শোনা যাক— 'কারিগর ও শ্রমিকদের ছোট পুঁজি সহজ প্রযুক্তির ছোট সংস্থাকে সহায়তা করা। পুঁজিতে সহায়তা , প্রযুক্তিগত পরামর্শ, বিক্রিতে সাহায্য।'

কেন শ্রম উদ্যোগ? — নাগরিক মঞ্চ র উপলব্ধিতে শিল্পসংস্থা ও শিল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বর্তমান গতিপ্রকৃতি যথেষ্ট আশঙ্কা জনক। অবাধ আমদানীর নীতিতে বেশী বেশী ঝোঁকার ফলে, পুঁজির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ না রাখার ফলে পুজি হয়ে উঠছে অনেক বেশী বেশী আক্রমণাত্মক। চালু কারখানা বন্ধ হওয়া, দেশীয় উৎপাদন বন্ধ হওয়া বা কমে যাওয়া এবং শ্রমিকের কাজ হারানো তাই অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান শিল্প ব্যবস্থা ও নীতির বিরোধিতা, বিকল্প শিল্প ও শ্রমিকভাবনা এসব তো নাগরিক মঞ্চের কর্মসূচীর মধ্যেই আছে। কিন্তু কর্মহীন শ্রমিকদের বেঁচে থাকার আশ্রয় হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ছোট উৎপাদনে সহযোগী পরিবেশের ব্যবস্থা করার, অন্তত দৃষ্টান্ত গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিতেই এই নতুন উদ্যোগ--শ্রম উদ্যোগ।

শ্রম উদ্যোগ কার্যত একটি ঋণ উদ্যোগ। শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি, সংস্থার সহযোগিতায় প্রাথমিক পুঁজিতে সাহায্য করা, শ্রমিক ও কর্মচারী সংগঠনের মাধ্যমে নিয়মিত বিনিয়োগের রসদ সংগ্রহ করার পাশাপাশি, উৎপাদন প্রস্তাব তৈরী, বাজার সমীক্ষা, বিপনন ইত্যাদিতেও সাহায্য করবে শ্রম উদ্যোগ।

ইতিমধ্যেই উত্তবঙ্গের কারিগরদের তৈরী বাঁশের জিনিষপত্র বিক্রি ও বিপণনে সাহায্য করছে শ্রম উদ্যোগ। মংপুং-এর একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নেপসন কালিমপং-এর অরণ্যের মহিলাও পুরুষদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল ওয়েষ্টবেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সহযোগিতায়। আপাতত

নেপসন ও ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন যৌথভাবে প্রশিক্ষিত কারিগরদের বাঁশের তৈরী নানা নিত্যব্যবহার্য আসবাব ও জিনিষপত্র তৈরীতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু এটা যাতে কারিগরদের নিজস্ব স্থায়ী একটি অর্থকরী উদ্যোগ হয়ে ওঠে তার জন্য শ্রম উদ্যোগ সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছে। এইসব জিনিষপত্র কেনার জন্য এবং অবশ্যই পরামর্শ ও অন্য নানাভাবে সহায়তার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে। নাগরিক মঞ্চ, 134 রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র রোড, ব্লক বি, রুম নং-7, কলকাতা-700085। ফোন 353 1921।

□□□□□

তুঘলকী?

আয়োডিনের অভাবে বা ঘাটতিতে ভারতে গলগণ্ড রোগের রীতিমত প্রার্দুভাব। এটা জানা ছিলো। দাওয়াই হিসেবে আয়োডিন যুক্ত নুন খাওয়ার পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হননি কেন্দ্রীয় সরকার। আয়োডিন বিহীন সাধারণ লবণ বিক্রিই নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এখন আবার প্রায়, আট বছর পর — কি থেকে কি হলো বদলে গেলো মতটা, নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হলো। এবার আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেঁকে বসলেন। তাঁরা বলছেন এরাজ্যের মানুষকে গলগণ্ডের শিকার হতে দেবেন না, নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

সাধারণ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রইলেন। এই ক'বছরে গলগণ্ডের প্রার্দুভাব কোথায় কতটা কমলো বা আদৌ কমলো কিনা, নাকি বাড়তি আয়োডিনে উল্টো বিপত্তি দেখা দিলো সে সম্পর্কে কি কেন্দ্রীয় সরকার কি রাজ্য সরকার — স্পিকটি নট!

আয়োডিন ঘাটতি হলে বিপদ, আবার বাড়তি হলেও বিপদ একথা জানা। আয়োডিন-ঘাটতি ভারতের বিশেষ বিশেষ ভৌগলিক এলাকাতেই সীমাবদ্ধ এটাও অজানা ছিলো না, তা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখেই সারা দেশে আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রী বাধ্যতামূলক করা হয়েছিলে। ক্ষমতা ও প্রয়োজন নির্বিশেষে মানুষ দুটাকা কেজির লবণ কিনছিলেন পাঁচ ছ'টাকা কিলোতে। আবার ঢালাও আয়োডিন খাইয়ে উল্টো বিপদ দেখা গেছে এমন ঘটনা পৃথিবীর অন্যত্র ঘটেছে। তাই জনসাধারণ দাবী জানাতেই পারেন- -প্রকৃত তথ্য জানানো হোক। নতুবা এমন মনে হতেই পারে যে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ বা আর এস এসের আপত্তির কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই ফতোয়া।

□□□□□□

প্রসঙ্গ : অরণ্যের অধিকার রাষ্ট্রীয় বনশ্রমজীবী মঞ্চের বৈঠক

7-9 জুলাই, 2000 মহারাষ্ট্রের নাগপুরে জড়ো হয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় বনশ্রমজীবী মঞ্চের সাথে যুক্ত নানান প্রদেশের বনবাসী, সক্রিয় কর্মী ও সহযোগী-শুভানুধ্যায়ীরা। সংখ্যায় এঁরা ছিলেন প্রায় 75 জন, স্থানীয় 10-15 জন নাগপুরবাসী বাদ দিয়ে।

এই মঞ্চের অনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়, '98 -এর সেপ্টেম্বরে রাঁচীর প্রথম কর্মশালায়। গত প্রায় দুবছরে দেশ জুড়ে প্রায় তিরিশটি আঞ্চলিক মিটিং বা কর্মশালা সংগঠিত হয়েছে বনবাসী ও বনের ওপর নির্ভরশীল শ্রমজীবীদের এবং স্থানীয় সামাজিক কর্মীদের নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে এধরণের দু-তিন দিনব্যাপী কর্মশালা হয়েছে যথাক্রমে মেদিনীপুরে, দশমাইল গ্রামে (শিলিগুড়ি থেকে সেভক রোডে 16 কিমি দূরে) ও কার্শিয়াঙে।

রাষ্ট্রীয় বনশ্রমজীবী মঞ্চের মূল বিষয় হল জঙ্গলের সাথে বনবাসী ও জঙ্গল-সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষের সম্পর্ক। মূল লক্ষ্য হল অরণ্যের অধিকার মানে জঙ্গল নির্ভর জীবিকা ও বন সম্পদ- দুয়েরই সংরক্ষণ। স্থানীয় বৈচিত্র্যে, সমস্যা ও লড়াইয়ের পন্থায় বিপুল ভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়টি আসলে এক ব্যাপক ক্যানভাসে চিত্রিত । পরিবেশের ভারসাম্য, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, সামাজিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, চালু উন্নয়নের দাপট, দেশজ আইন ও তার রক্ষক—সব মিলিয়ে এ এক দ্বান্দিক, সদাসচল, গতিময় জগত, যে জগতে পেছিয়ে পড়া মানুষই কোনঠাসা, যে জগতের সমস্যা ও লড়াইয়ের তথ্য বা তত্ত্বের খবর এখনও সুপরিচিত নয়। বনশ্রমজীবি মঞ্চের প্রাথমিক সমীক্ষা পত্র বা স্ট্যাটাস রিপোর্ট এখন প্রস্তুতিরপথে।

এই পটভূমিতে নাগপুরের 'ন্যাশনাল কনসালটেশন' থেকে জানা গেলো নানা অঞ্চলের বনজীবী মানুষের বিষয়ে মতামত ও অবশ্যই অভিজ্ঞতার কথা। যেমন তামিলনাড়ু বননির্ভর ভ্রাম্যমান (জিপসী) জনগোষ্ঠীর কালক্রমে শহরমুখী হওয়ার বাধ্যবাধকতার কথা, ওড়িশার কেন্দ্রাপাড়ার কেন্দুপাতা সংগ্রহকারী হাজার হাজার মহিলা শ্রমজীবীদের ন্যূনতম মজুরীর সফল লড়াই, তামিল নাড়ুর তফসীলী সম্প্রদায় ও দলিত বনবাসীদের চরম দৈন্য, হিমাচলের গদ্দী সম্প্রদায়ের অরণ্য ও গোচরণ ভূমি গ্রাস হয়ে যাওয়ার সমস্যা-কেরল, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, ওড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ডের নানান আদিবাসী মানুষের জঙ্গল নির্ভর

... এর পর 28 পৃষ্ঠায় দেখুন

একটি অপরূপকথা

1854 সালে ওয়াশিংটন থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সিয়াট্‌ল্‌ উপজাতির লোকেদের নির্দেশ দেন তাদের বসতি এলাকা ছেড়ে চলে যেতে কেননা সেখানে তৈরি হবে আধুনিক সভ্য শহর-অঞ্চল। এই নির্দেশের উত্তরে সিয়াট্‌ল্‌ উপজাতির প্রধান একটি চিঠি দেন রাষ্ট্রপতিকে, - - উপজাতির ভাষায় যিনি সাদাদের বড়ো সর্দার। এই সুন্দর চিঠিখানা সারা পৃথিবীর পরিবেশবাদীদের দর্শনকে সবচেয়ে সুন্দর ও সরলভাবে প্রকাশ করে। রাষ্ট্রসংঘ এই দলিলটিকে গ্রহণ করেছেন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতীক বলে। ইংরেজী থেকে যথাসম্ভব মূলানুগ সামান্য সংক্ষেপিত বাংলা অনুবাদ ছাপা হল।

ওয়াশিংটনের সাদা-সর্দারের কাছে সিয়াট্‌ল্‌ উপজাতির প্রধানের চিঠিঃ 1884

- কি করে তোমরা বেচাকেনা করবে আকাশ, ধরিত্রীর উষ্ণতা? আমরা তোমাদের চিন্তা বুঝতে পারি না।
- বাতাসের সতেজতা, জলের ঝিকিমিকি— আমরা তো এগুলোর মালিক নই, তবে তোমরা (আমাদের থেকে) এগুলো কিনবে কেমন করে?
- এই ধরিত্রীর প্রতিটি অংশই আমার লোকেদের কাছে পবিত্র। পাইন গাছের প্রত্যেকটি চক্‌চকে ডগা, বালুকাময় প্রতিটি সমুদ্রতট অন্ধকার বনভূমিতে জমে থাকা কুয়াশা, প্রতিটি প্রান্তর, প্রত্যেকটি পতঙ্গের গুণগুণ আমাদের লোকেদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিতে পবিত্র। প্রতিটি বৃক্ষের ভিতর দিয়ে যে বৃক্ষরস প্রবাহিত হচ্ছে তা লালমানুষদের স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে।
- আমরা এই ধরিত্রীর অংশ, এও আমাদের অংশ।
- সুগন্ধ ফুলগুলি আমাদের বোন, হরিণ ঘোড়া বিশাল সব ঈগল পাখি—এরা আমাদের ভাই।
- পাহাড়ের পাথুরে সব গহ্বর, সরস মাঠ, ঘোড়ার বাচ্চার গায়ে যে উষ্ণতা আর মানুষ—সবকিছু মিলে একই পরিবার।
- তাই জন্য ওয়াশিংটনের বড় সাদা সর্দার যখন বলে পাঠায় যে সে আমাদের দেশ কিনে নিতে চায় তখন সে আমাদের কাছ থেকে অনেক বেশি কিছুই চায়, বড় সর্দার আমাদের জানিয়েছে সে আমাদের বাস করবার জন্য একটা রিজার্ভ অঞ্চল দেবে যেখানে আমরা আরামে থাকব। সে আমাদের পিতার মত হবে, আমরা তার সন্তানের মত হব। সুতরাং আমরা তার কথা বিবেচনা করে দেখব।
- কিন্তু এটা এত সহজ নয়। এই ভূমি আমাদের কাছে পবিত্র।
- এই যে নদীর জল ঝিলমিল করে বয়ে যাচ্ছে এ শুধু জল নয়, এ আমাদের পূর্বপুরুষের রক্ত।
- যদি আমরা এই ভূমি তোমাদের দিয়ে দিই তাহলে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে এই ভূমি পবিত্র। তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদেরও নিশ্চয় করে শেখাবে এর পবিত্রতার কথা। তাদের শিখিও যে এখানকার হ্রদগুলির পরিষ্কার জলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যেকোন রহস্যময় ছায়াই আমাদের মানুষদের জীবনের কোন-না-কোন ঘটনার স্মৃতি।
- ঝরনাগুলোর জলের মর্মরে আমার বাবার ও তার পিতৃপুরুষদের স্বর শোনা যায়।
- নদীরা আমাদের ভাই, তারা আমাদের তৃষ্ণা মেটায়। নদীরা আমাদের ক্যানো বয়ে নিয়ে যায়, আমাদের ছেলেমেয়েদের মুখে খাবার জোগায়। যদি আমরা আমাদের দেশ তোমাদের দিই তাহলে তোমরা মনে রেখো, তোমাদের ছেলেমেয়েদের শিখিও যে নদীরা মানুষের ভাই সুতরাং তোমরা নদীদের সেরকমই যত্ন কোরো যেমন তোমরা তোমাদের ভাইদের করো।
- সাদা মানুষেরা আমাদের ধরণধারণ বোঝে না। তার কাছে পৃথিবীর এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের কোনো তফাৎ নেই, কেননা সে ভিনদেশী—রাত্রির অন্ধকারে আসে, নিজের যা দরকার মাটির কাছ থেকে কেড়েকুড়ে নিয়ে চলে যায়। এই ধরিত্রী তার আত্মীয় নয়, তার শত্রু। সে একে জয় করে, তারপর ফেলে দিয়ে যায়। সে পেছনে ফেলে দিয়ে যায় নিজের পিতার কবর। কিছুই মনে করে না। নিজের সন্তানদের কাছ থেকে পৃথিবীকে সে চুরি করে, কিছুই মনে করে না।
- তার পিতৃপুরুষের কবর, তার সন্তানদের অধিকার সে ভুলে যায়। তার মা এই ধরিত্রী, তার ভাই আকাশ—এসবকে সে মনে করে ভেড়া কিংবা রঙিন পুঁতির মত কেনাবেচা করার, লুঠ করার জিনিষ।
- তার লোভ এই পৃথিবীকে খেয়ে ফেলবে, পড়ে থাকবে কেবল এক মরুভূমি।
- আমরা এসব বুঝতে পারি না। আমাদের ভাবনা অন্যরকম।
- তোমাদের শহরগুলি লাল মানুষদের চোখে ব্যথা দেয়। অবশ্য

আমরা লাল মানুষরা জংলী, তাইজন্যই হয়ত এমন হয়।

- সাদা মানুষদের শহরে কোথাও শান্ত নিরিবিলি জায়গা নেই— যেখানে বসে বসন্তকালে পাতার কুঁড়িগুলোর খুলে যাবার শব্দ শোনা যায়।
- অবশ্য হয়তা আমরা জংলী বলেই আমাদের এরকম মনে হয়। এত গোলমাল মনে হয় যেন তা মানুষের কানকে অপমান করছে। জীবনের কী মূল্য আছে একজন লোক যদি জলের ঘূর্ণির আপন মনে একাকী গুণগুণ করার শব্দ শুনতে না পায়। কিংবা রাত্রে ব্যাঙেদের বকবকানি? আমি একটা লাল মানুষ, আমি এ সবের কিছু বুঝতে পারি না। ...
- লাল লোকেদের কাছে বাতাস পবিত্র আর মূল্যবান কেননা জন্তু গাছ মানুষ সবাইকার নিঃশ্বাস এই একই বাতাসের মধ্যে ধরা আছে।
- সাদা মানুষেরা যে বাতাসে নিঃশ্বাস নেয় তার দিকে মন দেয় না। অনেকদিনের বাসি মৃতদেহের মত হয়ে গেছে তারা, তাদের আশপাশের বাতাসের দুর্গন্ধ তারা আর বোধ করে না।
- কিন্তু আমরা তোমাদের দিয়ে দেব আমাদের জমি, মনে রেখো এই বাতাস আমাদের কাছে মূল্যবান। বাতাস যে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে তার সঙ্গে মিশে থাকে। যে বাতাস আমাদের পূর্ব পুরুষদের বুকে তার প্রথম নিঃশ্বাসটি দিয়েছিল, সেই তার শেষ নিঃশ্বাসটিকে ধরে রেখেছে।
- যদি আমাদের জমি আমরা তোমাদের দিই তাহলে একে আলাদা এবং পবিত্রই রাখতে হবে তোমাদের, যাতে এমন কি সাদা মানুষদেরও জায়গা থাকে কখনো কখনো মাঠের ফুলের মিষ্টিগন্ধে ভরা বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার।
- তোমরা আমাদের ভূমি কিনে নিতে চাও, একথা আমরা ভেবে দেখব কিন্তু সাদাদেরও শর্ত করতে হবে যে আমাদের জায়গা কিনে নিলে সেখানকার প্রতিটি জন্তুকে ভালোবাসতে হবে নিজের ভাইয়ের মত। ...
- জীবজন্তু ছাড়া মানুষ কী! যদি পৃথিবীতে কোন জানোয়ার না থাকে আত্মার একাকীত্বে মানুষ নিজেও মরে যাবে।
- জন্তুজানোয়ারদের যা হবে কিছুদিন পরে মানুষেরও তাই হবে। সবকিছুই একে অন্যের সঙ্গে জড়ানো।
- তোমাদের সন্তানদের শিখিও যে তাদের পায়ের তলায় যে মাটি তাতে আছে তাদের পিতৃপুরুষদের দেহাবশেষ, তাই মাটিকে যেন তারা শ্রদ্ধা করে। তোমাদের সন্তানদের শিখিও এই মাটিতে আছে তার পূর্বজদের ছাই। আমাদের স্বজনদের প্রাণ মাটিতে মিশে একে সমৃদ্ধ করেছে।
- তোমাদের ছেলেমেয়েদের শিখিও যা আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের শেখাই— যে এই ধরিত্রী আমাদের মা। যা মায়ের হবে তার সন্তানদেরও তাই হবে। যদি কেউ মাটিতে থুতু ফেলে সে তার নিজের গায়েই থুতু ফেলছে।
- একথা আমরা জানি যে এই পৃথিবী মানুষের সম্পত্তি নয়, মানুষই পৃথিবীর। আমরা একথা জানি। ...
- এই পৃথিবীর যা হবে পৃথিবীর সন্তানদেরও হবে তাই। জীবনের এই ছড়ানো জাল, মানুষ একে বোনে নি সে কেবল একটি সুতো মাত্র। এই জালটিকে সে যা করবে তার নিজেরও হবে ঠিক তাই।
- এমনকি সাদা লোকেরা, তারাও সকলে এই সাধারণ নিয়তির বাইরে নয়।
- শেষ অবধি হয়ত দেখা যাবে যে আমরা সকলেই একে অন্যের ভাই।
- যে কথা আমরা জানি হয়ত একদিন সে কথা সাদারাও বুঝতে পারবে যে—আমাদের ঈশ্বর আসলে একই।
- আজ তোমরা ভাবো ঈশ্বর তোমাদেরই। যেমন তোমরা আমাদের এই দেশকে দখল করে নিতে চাও তোমাদের নিজেদের বলে, কিন্তু তা তোমরা পারবে না। যে সব মানুষের ঈশ্বর, তার দয়ার কাছে সাদা এবং লাল মানুষ একইরকম।
- এই পৃথিবী তার কাছে অতিমূল্যবান, এর ক্ষতি করা মানে এর সৃষ্টিকর্তার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখানো।
- সাদা মানুষেরাও চলে যাবে পৃথিবী থেকে। হয়ত অন্যদের থেকে একটু তাড়াতাড়িই যাবে।
- হয়তো ধংস হয়ে যাবার সময়েও তোমাদের দেখাবে উজ্জ্বল, ঈশ্বরের শক্তির আগুনে দীপ্যমান কেননা ঈশ্বর তোমাদের এই দেশে এনেছেন, লাল মানুষদের ওপরে আধিপত্য দিয়েছেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।
- সেই নিয়তি আমাদের কাছে এক রহস্য কেননা তাকে আমরা বুঝতে পারি না। যখন সমস্ত মহিষ নিহত হবে, সমস্ত বুনো ঘোড়াকে পোষ মানানো হয়ে যাবে, অরণ্যের প্রতিটি কন্দর ভারী হয়ে উঠবে ভিড়ের গন্ধে, প্রবীণ পাহাড়গুলি বলতে চাইবে—

ঝোপজঙ্গলগুলো কোথায়? নেই!
ঈগলগুলো কোথায়? নেই!
বেঁচে থাকা শেষ, কোন রকমে টিকে থাকার শুরু। □

চি ঠি প ত্র

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকায় (অক্টো—ডিসেম্বর, 1999) চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সুলিখিত প্রবন্ধ দুইটি গুরুত্বপূর্ণ এক সমস্যার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মূল সমস্যাটি বেশ জটিল এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এমন সমাধান নির্ণয় করাও কঠিন। তা সত্ত্বেও এই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

দেড়শত বছর আগে চিকিৎসা শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলা সঙ্গত ছিল কিনা সন্দেহ। বেশির ভাগ রোগের কারণ অজানা ছিল, চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল অনুমান ভিত্তিক। জীবাণু অবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু বিশেষ রোগের সঙ্গে বিশেষ প্রকার জীবাণুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জীবাণু রোধক ওষুধ না থাকায় অপারেশন সফল হলেও রোগীকে বাঁচান যেত না। বিগত দেড়শ' বছরে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। রোগ নির্ণয় পদ্ধতির বিরাট উন্নতি হয়েছে, বহু রোগের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার শল্য চিকিৎসায় যুগান্তর এনেছে। অন্যান্য বহু রোগ নিয়ে বিশ্বব্যাপী গবেষণার কাজ চলেছে। পরিবর্তন চমকপ্রদ, সন্দেহ নেই। কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে বেশ কিছু নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। প্রথম সমস্যা, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, অনেকের পক্ষেই চিকিৎসা বিষয়ে কি করণীয় নির্ধারণ করা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় সমস্যা, চিকিৎসকদের সমস্ত লক্ষ্য রোগের উপর নিবদ্ধ হওয়ায়, রোগী (বা তার পরিজন) সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে, চিকিৎসা বিষয়ে কি করা সম্ভব, এই সমস্যায় চিকিৎসকের কাছ থেকে কোন পরামর্শ পাচ্ছেন না। যিনি চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা করেন তিনি বিজ্ঞানীর মত নিস্পৃহভাবে কাজ করেন কারণ রোগীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগ নেই। কিন্তু যিনি চিকিৎসক তিনি রোগী সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে চিকিৎসা করতে পারেন না। রোগীর মনের সঙ্গে তাঁর একটা যোগ থাকার প্রয়োজন আছে, সফল চিকিৎসার কারণেই এটা দরকার। স্বল্প কিছু ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, অধিকাংশ চিকিৎসকের ধারণা সম্ভবতঃ এই যে, চিকিৎসার সময় ডাক্তার রোগ নিরাময়ের সর্বাধিক উপযুক্ত চিকিৎসার কথাই জানাবেন, রোগীর আর্থিক সঙ্গতির কথা চিন্তা করার দায়িত্ব তাঁর নয়। বাস্তবের এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণে নানা কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

1) অসুখ সারাবার মত নিশ্চিত চিকিৎসা জানা নেই। পরীক্ষামূলক কিছু চিকিৎসা আছে, যা নার্সিং হোমে ভর্তি করে করতে হবে। চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এতে রোগীর জীবনের মেয়াদ কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।

2) অসুখের নিশ্চিত চিকিৎসা জানা আছে, কিন্তু তা এত ব্যয়সাধ্য যে পরিজনদের পক্ষে সেই অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব।

3) নিশ্চিত চিকিৎসা জানা নেই। কিছু ক্ষেত্রে সারে এমন ব্যবস্থা আছে কিন্তু সেই চিকিৎসার ব্যয় নাগালের বাইরে।

বি ও বি পত্রিকায় 'অন্য চিকিৎসা' প্রবন্ধে 1) নম্বরে বর্ণিত পরিস্থিতির একটি উদাহরণ আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের পৃঃ 13. শেষ প্যারাগ্রাফে যে মন্তব্য করা হয়েছে সেটাই এক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান। ডঃ ডেভিড ওয়ার্ণার লিখিত 'যেখানে ডাক্তার নেই' গ্রন্থে এই বিষয়ে যে মন্তব্য আছে, সেটা উদ্বৃত করছি, 'আমরা প্রায়ই একটা ভুল করি। যে মরতে চলেছে তাকে যতদিন পারা যায়—যে ভাবেই হোক, বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করি। কখনো কখনো, এতে লোকটির নিজের আর তার বাড়ির লোকের ভোগান্তি আর ধকল বেড়ে যায়। এমন সময় আসে যখন আরো ভালো ওষুধ বা 'আরো ভালো ডাক্তার' না খুঁজে যে মরতে বসেছে তার কাছে থেকে তাকে মদত দিলেই সব থেকে দরদের কাজ হয়। তাকে বুঝতে দিন যে তার সঙ্গে আপনি যে এতদিন এত আনন্দ, দুঃখ সব ভাগ করে নিয়েছেন তার জন্য আপনি সুখী। আর আপনি নিজে তার মৃত্যুটা মেনে নিতে পারছেন। শেষের কয়েকটা ঘন্টায় ওষুধের থেকে অনেক বেশি দরকার হল ভালবাসার আর মেনে নেওয়ার।'

পত্রিকার 'জয়শ্রী ও তাকে ঘিরে আমরা সকলে' প্রবন্ধটিতে 3) নম্বরে উল্লেখিত পরিস্থিতির একটা ঘটনার আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নবিত্ত পরিবারের ষোলো বছরের মেয়ে জয়শ্রীর দুটো কিডনি-ই নষ্ট হয়ে গেল। চিকিৎসার প্রচেষ্টায় আত্মীস্বজনের পাশে এসে দাঁড়ালো ঐ অঞ্চলের সমস্ত লোক ও প্রতিষ্ঠান। সমবেত চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করে ভেলোরে চিকিৎসা করিয়ে চোদ্দ বছর জয়শ্রীকে বাঁচিয়ে রাখার বিস্ময়কর একটি কাহিনী। শেষ পর্যন্ত জয়শ্রীকে বাঁচানো যায় নি। সেই কারণে এত বড় একটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে একথাও বলা চলে না। সমস্যাটা অন্যখানে। এমন হতে পারত যে অসুখটায় জটিলতা থাকার জন্য এ দেশে অপারেশন সম্ভব নয়, আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া

প্রয়োজন। তখন এত বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে যে সমবেত প্রচেষ্টাতেও তা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তখন চিকিৎসার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে? অথবা জয়শ্রী'র যে পরিজন ও পরিবেশ ছিল, তার থেকেও অনেক বেশি দরিদ্র পরিবেশে কারও যদি এই অসুখ করত, যারা চিকিৎসার অর্থ সংগ্রহে অক্ষম, তখন কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারত? এই ধরনের সমস্যাগুলি এখন বহুক্ষেত্রেই বাস্তব আকারে দেখা দিচ্ছে। অনুমান করা যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে এই রকম সমস্যার সংখ্যাও বাড়বে। দেশের সরকারের এবিষয়ে কিছু করণীয় আছে। কিন্তু কতটা? স্বেচ্ছসেবী প্রতিষ্ঠানও স্থানীয় অধিবাসীরাও কিছুটা করতে পারে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মীর প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করে আমার মনে হয়েছে এই জটিল সমস্যার বিষয়ে আরো আলোচনার প্রয়োজন আছে।

শেষ করার আগে একটা কথা বলি। মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনও হয়তো কিছুটা সহায়ক হতে পারে। জীবন যত দীর্ঘ হবে, তার সার্থকতাও তত বেশি হবে এমন তো নয়। স্বল্প দৈর্ঘ্যর জীবনে পূর্ণ সার্থকতা আসতে পারে, দীর্ঘ জীবন অর্থহীন হতে পারে। আলোচ্য সমস্যার প্রসঙ্গে বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে।

শ্যামল সেনগুপ্ত

... 25 পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ

জীবনযাত্রার নানান বিপত্তির কথা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত বনবস্তি, বাসিন্দাদের হাল হকিকৎ, দক্ষিণবঙ্গের বিক্ষিপ্ত বনাঞ্চলের খবরাখবর।

নানান বিষয়ে মতামত বিনিময় তর্কবিতর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া চলে মূলতঃ শেষ দিনটা জুড়ে। কেন্দ্রীয় স্তরে বন শ্রমজীবী মঞ্চ পুনর্গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, বিদর্ভ, হিমাচল, গুজরাট, তামিলনাড়ু ও উত্তরাঞ্চল থেকে প্রতিনিধি নিয়ে। পাশাপাশি রাজ্য স্তরের প্রাথমিক কমিটিও তৈরী হয় এই রাজ্যগুলিতে।

মূল স্রোতের বাইরে কত ধরণেরই না লড়াই চলছে! নাগপুরে বৈঠক শেষের সেই চমৎকার গানের সুরটা এখনও কানে বাজছে—কথাগুলোতেও যেন কী আছে!

'যো দেখতে হ্যায়, শুনতে হ্যায়
ফির ভি কুছ না বোলতে হ্যায়
—উনমে সে তু নেহী?' □

পত্র পত্রিকার প্রাপ্তি স্বীকার

বিওবি-র দপ্তরে যে সমস্ত পত্রপত্রিকা নিয়মিত আসে অলাদা করে তার প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়ে ওঠেনা। তাই এইভাবে কাজটি সারা হল। সম্প্রতি হাতে পাওয়া পত্রিকাকটি হল :

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

পঞ্চম সংখ্যা (মে 2000) ও ষষ্ঠ সংখ্যা (জুন 2000)। প্রতি সংখ্যার মূল্য 10 টাকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি 23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা -700006

জ্ঞান বিচিত্রা

নবম সংখ্যা (মার্চ 2000), 15 টাকা
11 জে. বি. রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা 799 001

সংবাদ পরিষেবা

মে ও জুন 2000
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা 50.00 টাকা
সার্ভিস সেন্টার, 58A ধর্মতলা রোড,
বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা 700042

চকমক (হিন্দী)(বাল বিজ্ঞান পত্রিকা)

মে 2000 এবং জুন 2000, মূল্য 10 টাকা, বার্ষিক 100 টাকা।

একলব্য, ই 1/25 অরোরা কলোনী, ভোপাল 462016 এম, পি, (মধ্যপ্রদেশ)।

ঈহা

সমাজও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা —(এপ্রিল-জুন 2000। মূল্য 5 টাকা।
133A তালবাগান মেইন রোড (ফিফথ লেন)
পোঃ নোনা চন্দনপুকুর
ব্যারাকপুর, 743102

দুটি প্রচার পুস্তিকা (ইংরেজী)

Organise Nonviolent Mass-movement Against the Indifference of Private--Public--Government, Semi-government Institutions and Organizations Concerns and Judicial Authorities in Prohibiting Smoking and Tobacco consumption --Ganganarayan Roy

প রি ক্র মা

□

সরকারি হাসপাতালে

॥ এক॥ আহত অবস্থায় পড়ে থাকা এক ব্যক্তিকে কে বা কারা হাসপাতালের এমার্জেনসিতে এনে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছিল। বহু রাত্রি অবধি বাড়ী না ফেরায় ওই ব্যক্তির পরিবারের লোকজন নানা জায়গায় ছোটাছুটি করতে করতে এক সময় ওই হাসপাতালেই এসে উপস্থিত হন। হাসপাতালের কেউ একজন তাদেরকে জানায় যে একটা বডি মর্গে পাঠানোর জন্য করিডোরে রাখা আছে। '—দেখতে পারেন আপনাদের লোক কিনা'!

—দেখা গেল সত্যি-ই তাই। তাদেরই লোক। কিন্তু একি! এখনও তো মরেনি। হৃদস্পন্দন রয়েছে দেহে! শিউরে উঠলেন বাড়ীর লোকজন। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন এক নার্সিং হোমে।

॥ দুই॥ ছোট্ট একটি শিশুর হার্ট অপারেশন হবে। রুটিন মাফিক অপারেশন শুরু হয়েছে। বুকের হাড় কেটে ফেললেন সার্জেন। এবার হাত দেবেন হার্টে। তার আগে হার্ট-লাঙ্ মেশিনটা রেডি করতে হবে। দেখা গেল এটির দায়িত্বে আছেন যিনি তিনি নেই সেখানে। খোঁজ করা হল। জানা গেল তিনি আসেননি সেদিন! —অথচ অপারেশন শুরু হয়ে গেছে! সামান্য প্রাথমিক খোঁজখবর বা প্রস্তুতি ছাড়াই!

দুটি ঘটনাই ঘটেছে এরাজ্যের নামকরা সরকারী হাসপাতালে। —এই নিয়ে কি মন্তব্য করা যায় সেই ভাষা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আর সে চেষ্টা করা হল না।

□□

এ্যাডমিনিসট্রেটিভ ট্রেনিং

ভোট আর এদেশে এখন খবর নয়। প্রায়ই হয় ভোট। তবে ভোট উপলক্ষ্যে অনেক ঘটনা ঘটে যা খবর পদবাচ্য। যেমন এবার সল্ট লেক মিউনিসিপ্যালিটির ভোটে হল। দু'পক্ষ সমান সমান সংখ্যক আসনে জিতছিল। শেষ ওয়ার্ডের ভোট গুন্‌তির সময় হল বিভ্রাট। ভোট যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। ভোটের হিসেবটা ওর পেট থেকে টেনে বার করা যাচ্ছে না। বহু কসরত করা হল। যন্ত্র অনড়। অথচ এই ওয়ার্ডের ফলাফলের ওপরই নির্ভর করছে দু'পক্ষের ভবিষ্যৎ! তখন ঘোষণা করা হল ওই যন্ত্র যে বুথে ছিল সেখানে ফের ভোট নেওয়া হবে। বুথটি ছিল সল্ট লেকে রাজ্য সরকারের এ্যাডমিনিসট্রেটিভ ট্রেনিং সেন্টার চত্বরে। রাজ্য সরকার এর পুরো সুযোগ নিল।

ভোট শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় গণ্ডগোল। —বোমাবাজি। পিস্তল নিয়ে ছোটাছুটি। চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি। পুলিশের এ্যাকশন। এর সচিত্র বিবরণ আমরা দেখেছি খবরের কাগজে। আর সজাগ যারা—দেখেছেন টিভি পর্দায়। —ভিডিও রেকর্ডিং-এ।

এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ ভোট দিতে বেরুবে কল্পনাই করা যায় না। এবং রিপোর্টারেরা খোঁজ নিয়ে দেখেছেন—সত্যিই বেরোননি বেশীর ভাগ ভোটার। ভোট দিতে গিয়ে কি শেষে প্রাণ দেবেন? আর প্রাণ গেলে সেবা করার জন্য এমন মরিয়া যারা তাদেরকেও তো বঞ্চিত করা হবে! তাই দরজায় খিল এটে বসেছিলেন ঘরে। তবে ভোটাররা না গেলেও ভোট পড়েনি এমন নয়। পড়েছে পঁচাত্তর শতাংশের ওপর! এবং স্বাভাবিকভাবেই সরকারে আসীন দলই জিতেছে।

রিপোলিংয়ের দিন গণ্ডগোল হবে জানাই ছিল। এবং পোলিং বুথটি যেহেতু রাজ্যের হবু প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরেই, তাই এই সুযোগে ট্রেনীদের ভোটের হাঙ্গামার একটি লাইভ ডেমনস্ট্রেশন দেওয়াটাই ছিল হয়তো কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। কারণ এ রাজ্যের রাজনীতি যে পথে এগুচ্ছে তাতে আগামী ভোটে এই গণ্ডগোল আরও ব্যাপক আকার ধারণ করবে। আর হাঙ্গামা সামাল দিতে ডাক পড়বে হয়তো এদেরই। তাই আগাম ব্যবস্থা। ফলে নির্দেশমত পুলিশ ধীরেসুস্থে কাজ করেছে। তবে এর সুযোগ যদি কোন দল নিয়ে থাকে তো সে অন্য কথা। সেজন্য তো সরকার দায়ী নয়!

□□□

কেন নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের পক্ষ থেকে দাবী উঠেছে—এ রাজ্যের জন্য একটি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র চাই। এ আওয়াজ আগেও উঠেছিল একবার। এক সময় থেমে গিয়েছিল। কেন থেমে গিয়েছিল জানা যায়নি তখন। এখন জানা গেল। জানালেন

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তখন নাকি কে বা কারা তাদের ভুল বুঝিয়েছিল। বলেছিল নিউক্লিয়ার প্রকল্পে না যাওয়াই ভালো। গোলমাল আছে ওতে। ঝুঁকিও বিস্তর।

এই ভুল ভেঙ্গেছে সম্প্রতি। ভাঙ্গিয়েছেন দলেরই একজন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক সাংসদ। এলেম আছে এঁর। এমন জাঁদরেল মুখ্যমন্ত্রীর 'না কে হ্যাঁ'-করিয়েছেন তিনি। এবং 'আগে ভুল হয়েছিল'—এহেন স্বীকারোক্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার করিয়েছেন। কি যাদুতে করলেন সেটাই রহস্যের!—লক্ষণীয় এহেন বিপজ্জনক প্ল্যান্ট তিনি নিজের এলাকাতেই বসাতে চান! অথচ অতি বড় 'প্রো-নিউক'ও এমনটা করার ভরসা পান না। এমন প্ল্যান্ট অন্যের ঘাড়ে বসুক সেটাই চান সকলে। শোনা গেল ইনি জায়গা বাছাইয়ের কাজ শুরু করিয়ে দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদল সুন্দরবন লাগোয়া কয়েকটি জায়গা নাকি ঘুরে দেখে গেছেন।

সাথে সাথে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। বাজারে যেমন প্রো-নিউক আছেন, তেমনি এ্যান্টি-নিউক লোকজনও আছেন। তারা নেমে পড়েছেন বাজারে। লেখালেখি করছেন। লোক ডেকে সভা করছেন। বোঝাচ্ছেন নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট কত বিপজ্জনক। কত ব্যয়বহুল। উৎপাদন কত কম। বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ কোথায় রাখা হবে কি করা হবে জানা নেই। এই অবস্থায় এ ধরণের প্ল্যান্ট বসানো ঠিক নয়। রুখতে হবে এমন উদ্যোগ। ইত্যাদি।

অন্য পক্ষ চুপ করে বসে নেই। বলছেন এসব অভিযোগের ভিত্তি নেই। দীর্ঘ-কালের হিসেবে নিউক্লিয়ার-বিদ্যুৎ সস্তা। কয়লার ধূলো-ধোঁয়া-গ্যাসের ঝামেলা নেই। নেই হাজার হাজার টন কয়লা পরিবহণের সমস্যা। তাই অনেক পরিচ্ছন্ন এই প্ল্যান্ট। প্ল্যান্ট সংলগ্ন এলাকার মানুষের প্ল্যান্টের ধূলো-ধোঁয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয় না। এখনকার প্ল্যান্ট আর তত বিপজ্জনকও নয়। হাজারো স্বয়ংক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই হয়। তাই নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট বসুক—ক্ষতি নেই।

দুপক্ষের চাপান-উতোরে হাঁ-অবস্থা সাধারণ মানুষের। সুইচ টিপলে আলো জ্বলে পাখা ঘোরে—এইটুকু জানে লোকে। সে বিদ্যুৎ কোথা থেকে আসে কিভাবে আসে কে রাখে সে খবর? আর দরকার-ই বা কি সে খবরে? কিন্তু এখন সে খবরও রাখতে হবে। শুধু রাখতে নয়—বলা হচ্ছে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক রায় দিয়ে।—তাও আবার এক লাফে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট নিয়ে!

সুন্দরবন এলাকার মানুষের আর রক্ষে নেই। দূরে যারা থাকেন তারা না হয় হুঁ-হাঁ শব্দ করে রেহাই পেতে পারেন—কিন্তু এদের সে রাস্তা বন্ধ। কোন না কোন এক পক্ষ বেছে নিতেই হবে। —উন্নয়নের পথ দেখিয়েদের পক্ষ অথবা সর্বনাশের ভয় দেখিয়েদের পক্ষ। এমনিতেই হাজারো বিভেদে জর্জরিত সাধারণ মানুষ। আরেক দফা বিবাদে জড়াতে হবে—আজব এক ইস্যুতে। যে ইস্যুতে তাদের পক্ষে নিজের মতো করে মতামত দেওয়া প্রায় অসম্ভব। অথচ ইস্যুটি তার জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং যার প্রভাব সত্যিই সুদূরপ্রসারী। এই এলাকার অনেক মানুষের হয়তো সুইচ টিপে একবার বাতি জ্বালিয়ে দেখার অভিজ্ঞতাটিও হয়নি জীবনে—এখন তাকে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের ভালো মন্দের হিসেব কষে ঝান্ডা ধরতে হবে এপক্ষে অথবা ওপক্ষে। মিটিং করতে হবে। মিছিল করতে হবে। করতে হবে হয়তো আরো কিছু। উৎসাহের সাথেই করবেন হয়তো। কেবল ঠিকঠাক তাঁতানোর অপেক্ষা।

তারপর মিটিং-মিছিল-অবস্থান-অবরোধ হবে। এমন কি ভাঙচুর-জ্বালানো-পোড়ানোর ঘটনাও ঘটতে পারে। এরপর পুলিশের যা কাজ করবে। অথচ মজার ব্যাপার হল—যারা এই প্ল্যান্ট বসানোর জন্য তদ্বির করছেন এবং যারা এর অনুমোদন দেবেন তাদের কারুরই বিদ্যুৎ-উৎপাদনটা মূল ইস্যু নয়। মূল ইস্যু হল—প্রকল্পটি চালু হোল কিনা দেখা। তাতেই কাজ হাসিল দু'তরফেরই।

যারা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের অনুমোদন দেবেন সেই এটমিক এনার্জি বিভাগের সেটা না দিয়ে উপায় নেই। কোথাও না কোথাও দিতেই হবে। এখানে না হোক অন্য কোনোখানে। এই অনুমোদনের ওপরই নির্ভর করছে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব। ফলে নিজের স্বার্থেই সেটা দেবেন। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এদেশে গড়ে উঠেছে হরেক নিউক্লিয়ার কর্মকান্ডের প্রতিষ্ঠান। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জোরে সে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেই চলেছে। এক অবিশ্বাস্য আকার নিয়েছে ভারতের নিউক্লিয়ার এস্টাব্লিশমেন্ট। সেখানে নিযুক্ত রয়েছে হাজার হাজার

সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনীয়ার, কারিগর, করণিক। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই বাহিনী। এরা আছে—এটা বাস্তব। তা এদের কাজ দিতে হবে না? এর ওপর চাকুরি আছে উন্নতি নেই—এমনটা তো আর হয় না। ফলে চাই নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর পদোন্নতি। পদোন্নতি মানে তো আর শুধু মাইনে বৃদ্ধি নয়। প্রতিপত্তিরও বৃদ্ধিও। ফাঁকা ময়দানে প্রতিপত্তি ফলানো যায়? ফলে চাই আরও কর্মীবাহিনী। চাই আরও আরও প্রকল্প। অব্যহতি নেই এই চক্কর থেকে।

অব্যহতি নেই এর জন্য তদ্বির করার লোকের হাত থেকেও। এমন প্রকল্প মানেই হাজার কয়েক কোটি টাকার মামলা। অজস্র নির্মাণের কাজ। নির্মাণ মানেই ইট বালি সিমেন্ট লোহা কাঠ পেইন্ট মজুর মিস্ত্রি ঠিকেদার ব্যবসাদার দালাল ফোড়ের কারবার। প্ল্যান্ট বসবে। শহর গড়ে উঠবে। পথঘাট হবে। হবে ঘর-দুয়ার-বাজার অফিস বাড়ি। বছরের পর বছর ধরে চলবে কাজ। —নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট বলে কথা! বেজায় জটিল। তায় আবার ঝুঁকির ব্যাপার। ফলে তাড়াহুড়ো নয়। গুলি মারো টাইম-সিডিউল-এর। এ নিয়ে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট মানে গোপন ব্যাপার। টাকা পয়সা নিয়ে যথেচ্ছার হোক—কিছু বলা যাবে না। কারণ নিউক্লিয়ার প্রকল্প মানে গোপন ব্যাপার। এমন কি সব শেষে হয়তো সেই রিয়াক্টর ক্রিটিকাল হল না—তালেও কিছু বলা যাবে না। কারণ গোপন ব্যাপার!

এবার ভাবুন তো এমন একটা শাঁসালো প্রোজেক্ট যেখানে চলবে সেখানকার দালাল-মোড়ল-মাতব্বরদের কি মওকা! তার ওপর কোনো কারণে যদি রিয়াক্টরটি চললো না—তাহলে? তাহলে তো ঝুঁকিও রইল না। অথচ 'কাজ'ও হল। এই যুক্তিটাই ওই সাংসদের যাদু নয় তো? **র.চ.**

... 3 পৃষ্ঠার অবশিষ্ঠাংশ

ক্রমবর্দ্ধমান উপলব্ধি, বন্ধুদের হারানো, পঙ্গু করে দেওয়া ব্যাধির যন্ত্রণা, এইসব অভিজ্ঞতা আমাদের বিহ্বল করে দিতে পারে, যদি না আমরা ধৈর্য্য, মানসিক ও আবেগগত স্পষ্টতা এবং নিজেদের ও অন্যদের প্রতি সমব্যথীত্ব—এইসব আত্মিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেগুলির মুখোমুখি হই।

সিদ্ধান্ত

জাঁ পল সার্ত্র বলেছিলেন, যতদিন পুঁজিবাদ আছে, ততদিন পর্যন্ত মার্কসবাদ এযুগের প্রধান দর্শন হিসেবে থেকে যাবে। কথাটা একই সাথে ঠিক ও ভুল। কথাটা ঠিক এই অর্থে যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতার শ্রেণীগত কেন্দ্রীভবনের ফলে সামাজিক কারণে সৃষ্ট বেদনাকে বোঝার জন্য মার্কসবাদী তত্ত্ব অপরিহার্য। শিল্প ও পুঁজি, সরকারী নীতি ও ক্ষমতা, এসব থেকে জাত বহু কার্যকলাপ ও তার নানা ফলাফল বোঝার জন্য মার্কসবাদ থেকে এক অতি প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া যায়। আত্মিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে পাওয়া আত্মজ্ঞান ও সমব্যথীত্বকে যুক্ত করতে হবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সঙ্গে। যদি তা না করা হয়, তবে আত্মিকতা বাস্তবের সাথে পরিবর্ত্তিত এক সম্পর্কের বদলে, বাস্তব থেকে পলায়নেরই সামিল হবে।

আবার সার্ত্রে-র দাবী ভুলও। ....মার্কস-এর পরবর্ত্তীকালে সামাজিক জীবনে যে জটিল পরিবর্ত্তন হয়েছে তার ফলে শুধু মার্কসীয় ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মুক্তি প্রদায়ী কোন সামাজিক তত্ত্ব ও সামাজিক আন্দোলনের দরকার, মার্কসবাদী পরম্পরার সবচেয়ে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি ও মানবিক লক্ষ্যকে অটুট রেখেই সেই পরম্পরাকে অতিক্রম করা।

অনুবাদ ঃ সুভাষ গাঙ্গুলী

গ্রাহকদের প্রতি

গত সংখ্যায় আপনার গ্রাহক পদ শেষ হয়ে গেছে। গ্রাহকপদ রিনিউ করে নিন। বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা এখন তিরিশ টাকা। মানি অর্ডারে টাকা পাঠালে স্লিপে আপনার নাম ও ঠিকানা লিখতে ভুলবেন না।

প্রিয় সুমহান নাগরিক

এ রুধির তোমাদের, হয়ত বা আমাদের
মানুষেরই রক্তের বন্যা!
এ যুদ্ধ পূবে হয়, পশ্চিমে ছেয়ে যায়—
রণদাপে ধরণী বিপন্না।

বোমা ভাঙে আঙিনা, বাড়ীঘর, সীমানা,
সৃজনের ইচ্ছে যে ক্ষইছে—
জ্বলে মাঠ তোমাদের, কিম্বা গো আমাদের,
ভুখা-পেট খিদে-জ্বালা সইছে!

চলে ট্যাঙ্ক এগিয়ে, নয়ত বা পেছিয়ে,
নিঃফলা হয় ধরা গর্ভ;
বিজয়ের চিৎকার, পরাজয়, শোকাচার
বাঁচাদের শবদাহ পর্ব।

সুমহান নাগরিক, যুদ্ধকে শত ধিক!
এ বিচার ফেরে যেন নাই আর—
তোমাদের গৃহকোণে, আমাদের বাতায়ণে,
জ্বলুক শান্তিদীপ অনিবার।

রিখ্যাত উর্দুকবি **শাহীর লুধিয়ানভির** "এ্যায় শরিফ্ ইনসানো" কবিতার বাংলা অনুবাদ।

কবিতাটির ইংরেজী বয়ান ভারত ও পাকিস্তানের পরীক্ষামূলক পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর 'বিওবি' প্রকাশিত 'নিউক্লিয়ার বোমা নয়' শীর্ষক বইয়ের চতুর্থ কভারে ছাপা হয়েছিল। পোখরান ও চাঘাইয়ে সেই কুৎসিত আস্ফালনকে স্মরণ করে কবিতাটি ফের প্রকাশ করা হল।

অনুবাদ করছেন—ওমপ্রকাশ চক্রবর্তী। ❑

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	:	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	:	বাংলা ও ইংরেজী
প্রকাশনার স্থান	:	P 252 লেক টাউন, ব্লক A, কলকাতা 700089
প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	:	রবীন মজুমদার
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ, 92, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা 700 009
মুদ্রকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা	:	ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি, 117 কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা 700 009

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি যে উপরিউক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বা : **রবীন মজুমদার,**
প্রকাশক, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*

VIJNAN O VIJNANKARMI Rn. No. 34929/79 Rs. 7.50

Vol XXII No. 1-2 JANUARY-JUNE 2000

পোখরান বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত

নিউক্লিয়ার বোমা নয়

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা

■■

মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার পঞ্চাশ বৎসর উপলক্ষে প্রকাশিত

রাষ্ট্রসংঘের মানবিক-অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা

মূল্য : পাঁচ টাকা

■■

রবীন মজুমদার-এর

পরিবেশ বিষয়ে প্রবন্ধ সংকলন

পরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাপ

মূল্য : ত্রিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : বুক মার্ক, নিউ হরাইজন, উৎস মানুষ

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী, পি 252 লেক টাউন, ব্লক A, কলকাতা 700 089

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি, 117 কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা 700 009 থেকে মুদ্রিত।